KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সাবিত্রী চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : নীতা ওরাওন
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫২/১ ৫২/২ ৫২/৩ ৫২/৪	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯৮ ॥ May 1991 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ ॥ Jun 1991 আষাঢ় ১৩৯৮ ॥ July 1991 শ্রাবণ ১৩৯৮ ॥ Aug 1991 Condition : Brittle : Good
Editor : অরুণ ঠাকুর	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৪ অগস্ট, ১৯৯১

ধনতন্ত্রের বর্তমান গতিপ্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ মাইকেল কালেসকির বিশ্লেষণ, বিশেষ করে তাঁর প্রদর্শিত "রাজনৈতিক বাণিজ্যচক্র"-এর প্রাসঙ্গিকতা সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন, অর্থনীতিবিদ ড· দেবকুমার বসু।

বাঙালির স্বরূপসন্ধান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার 'রাজনীতি ও পূর্ববঙ্গের কবিতা ঃ সম্পর্কের কার্যকারণ'—বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার।

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" সন্দর্ভে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে ড· অরুণা হালদারের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

ভাষাবিজ্ঞানে ভারতীয় অবদান সংক্রান্ত বিমলকৃষ্ণ মতিলাল-এর বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনা "লোগোসেন্ট্রিজম ঃ ভর্তৃহরি, দেরিদা ও মতিলাল।"

সঠিক পার্টি থাকলেই কি সফল বিপ্লব সম্ভব? একটি গ্রন্থকেন্দ্রিক অনুসন্ধিৎসু আলোচনা।

দেশভাগ-এর মতো বিপর্যয়-সৃষ্টিকারী ঘটনার ছায়া বাঙলাসাহিত্যে কতটুকু প্রতিফলিত? এই নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন, "অনুপস্থিত মহাকাব্যের ছায়া ঃ দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও বাঙলা কথাসাহিত্য"।

কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার স্বরূপ এবং প্রতিবিধান নিয়ে মতামত।

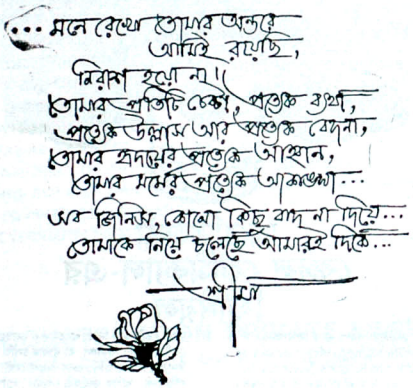

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৪
অগস্ট ১৯৯১
শ্রাবণ ১৩৯৮

ধনতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ে মার্কসীয় অর্থনীতির প্রাসঙ্গিকতা
দেবকুমার বসু ২৬৯

রাজনীতি ও পূর্ববঙ্গের কবিতা : সম্পর্কের কার্যকারণ অশ্রুকুমার সিকদার ২৮১

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা অরুণা হালদার ৩০৪

রোগা মেঘ অমিতাভ দাশগুপ্ত ২৭৬

ভারতবর্ষে মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ২৭৭

একটি ম্লান বিন্দুর দিকে পার্থপ্রতিম মণ্ডল ২৭৮

পাশাপাশি আছে কালী মোহান্ত ২৮০

নিজ নিকেতন সমীরকুমার রায় ২৯৬

গ্রন্থসমালোচনা ৩১৭

কমলেন্দু ধর, বেণু গুহঠাকুরতা, মেঘ মুখোপাধ্যায়,
ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৩৪১

দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও বাঙলা কথাসাহিত্য অচিন্ত্য বিশ্বাস

মতামত ৩৫০

রফিক-উল ইসলাম, সুরজিত দাস

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

মাঝারী বা বড় শিল্প গড়তে ডব্লু. বি. আই. ডি. সি'র সাহায্য নিন

আপনার প্রস্তাবিত প্রকল্পের যন্ত্রাংশের দাম ৩৫ লক্ষ টাকার বেশী হলেই তা মাঝারী শিল্প বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে ডব্লু. বি. আই. ডি. সি. আপনাকে সবরকম সাহায্য করতে পারে। যেমন :—

শিল্পনির্বাচন থেকে শুরু করে সরকারী অনুমোদন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, ৯০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেয়াদী ঋণ, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আই. ডি. বি. আই-এর সীড ক্যাপিটাল ও অন্যান্য আকর্ষণীয় সাহায্য এবং রাজ্য সরকারের নানারকম অনুদান ইত্যাদি।

নিম্ন ঠিকানায় অবস্থিত "শিল্পবন্ধু" আপনাকে বিদ্যুৎ, জমি, সেল্‌স্ ট্যাক্স, দূষণপ্রতিরোধ, সরকারী অনুমোদন ইত্যাদি বাকী সব সাহায্য ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে। এখানে এইসব সংস্থার অফিসারদের সাথে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে ২টার মধ্যে কথা বলতে পারেন।

বিশদ জানতে হলে যোগাযোগ করুন :—

পাব্লিক রিলেশন্স ম্যানেজার,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
৫, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট (তৃতীয় ও চতুর্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নং : ২৮-৬৬৪৮ / ৬৬৬৯ / ৬৬৭৬ / ৬৬৯৫
অথবা
এ-২/১৪৯, সফদারজঙ্গ এনক্লেভ, নতুন দিল্লী-১১০ ০২৯
ফোন নং : ৬০-৩৩৫৩

With Best Compliments from

Dr. R. B. Singh

HAHNEMAN HOMŒO CENTRE
BHADRESWAR, HOOGHLY

ধনতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ে মার্কসীয় অর্থনীতির প্রাসঙ্গিকতা

দেবকুমার বসু

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মার্কসবাদ বর্তমান যুগের পক্ষে আর উপযোগী নয়। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কসবাদী চিন্তায় যেসব পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, তা করা সম্ভব হয় নি; এটা তার দুর্বলতার প্রধান কারণ। তিরিশের দশকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল, কেইনস সেই সময়ে তাঁর সৃজনশীল চিন্তায় ধনতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এক বিশেষ অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে চলার পথে যে বিঘ্নগুলির সৃষ্টি হচ্ছিল, তা সংশোধন করার মতন বিচক্ষণতা মার্কসবাদীদের মধ্যে দেখা যায় নি; আজকের বিপর্যয় তারই ফল। সাধারণভাবে এই অভিমত এখন প্রায় সর্বস্বীকৃত।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সময়োপযোগী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মার্কসবাদীদের এই ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার থেকে যে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের পক্ষেও মার্কসবাদ অচল—তার কোনো ভিত্তি আছে কি? পক্ষান্তরে এটা বলা যায় যে, ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত তো হয়ই নি, বরং ধনতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে মার্কসীয় অর্থনীতির সাহায্য অপরিহার্য। এই প্রবন্ধে আমরা তার যুক্তিগুলি আলোচনা করেছি।

একথা সকলের কাছে না হলেও, অনেকের কাছেই অজানা যে বিংশ শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কিভাবে সংকটের সৃষ্টি হয় এবং ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তার সাময়িক প্রতিবিধান কী ধরনের হতে পারে, তার মার্কসবাদী বিশ্লেষণ কেইনসের রচনা প্রকাশ হবার আগেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভাবে করেছিলেন প্রখ্যাত পোলিশ অর্থনীতিবিদ মাইকেল কালেসকি প্রায় একই ভঙ্গিতে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধে কালেসকি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার নির্ভর করে মূলধনের বিনিয়োগের উপর; আর মূলধনের বিনিয়োগ নির্ভর করে বাজারে ভোগ্যপণ্যের বিক্রয় থেকে কত মুনাফা আয় হয় তার উপর।

১৯৩৬ সালে কেইনস তাঁর আলোড়নসৃষ্টিকারী *The General*

Theory of Employment, Interest and Money গ্রন্থে যে বক্তব্য প্রকাশ করেন, তার মৌলিক বিষয়গুলির সঙ্গে কালেসকির মতামতের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করেছি। কেইনসের বক্তব্যের অন্যতম বিষয় ছিল—অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা; কেইনস বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে দেখান কেন তখনকার পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে সক্রিয়ভাবে অর্থনীতিতে জড়িত হতে হবে। কালেসকির মতন মার্কসবাদীর পক্ষে এ ধরনের যুক্তি উপস্থিত করা খুবই স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে। কিন্তু স্বাধীন এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির তত্ত্বে বিশ্বাসী কেইনসের পক্ষে এই ধরনের প্রস্তাব একেবারে অভিনব। কেইনস প্রস্তাব করলেন যে, দেশের ধনিকশ্রেণী যদি কোনো সময়ে লাভের হার কমে যাবে এই আশঙ্কায় মূলধন-বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেন, এবং তার ফলে অর্থনীতি সংকটের মধ্যে পড়ে, তখন দেশে কর্মসংস্থান আর আয়বৃদ্ধির স্বার্থে রাষ্ট্রকে অগ্রণী হয়ে বিনিয়োগের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। প্রচলিত অর্থনীতিতত্ত্বে বিশ্বাসী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদকের কাছে এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কেইনসের অভিমত তাই তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত করে। কেইনসকে তাঁর সতীর্থদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। শেষ পর্যন্ত কেইনসের পরামর্শ গ্রহণ করে কিভাবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি উপকৃত হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বলা যায় যে, ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগতে অনেক অর্থনীতিবিদ অধুনা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে ব্যক্তি-মালিকানায় হস্তান্তরের জন্য যেসব যুক্তি দিচ্ছেন, সেগুলি তিরিশের দশকের কেইনস-বিরোধী যুক্তিগুলির প্রতিধ্বনির মতন শোনায়।

কালেসকি ও কেইনসের প্রায় একই সঙ্গে অর্থনীতিশাস্ত্রে নতুন আবিষ্কার বিভিন্ন কারণে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিজ্ঞানজগতে প্রায়শই এটা ঘটে যে কোনো একটি নতুন তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের তত্ত্বের নতুন প্রয়োগ একই সঙ্গে একাধিক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছেন। এসব ক্ষেত্রে কার অগ্রাধিকার, তা অনেক সময়ে সহজে নিষ্পত্তি করা যায় না; অনেক সময় তার প্রয়োজনও হয় না। বিজ্ঞানী মহলে এটা স্বীকৃত যে বেতার-তরঙ্গের আবিষ্কার মার্কনি, পোপোভ এবং জগদীশচন্দ্র বসু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন দেশে করেছিলেন। কাঠের কোনো দণ্ডের কিছুটা অংশ জলের মধ্যে রাখলে দণ্ডটি বাইরে থেকে ঈষৎ বাঁকা দেখায়। গণিতবিদ দেকার্তে এই নিয়ে প্রথম এবং স্বাধীনভাবে অঙ্ক কষে প্রমাণ করেন যে দুই রকমের ঘনত্ববিশিষ্ট মাধ্যমে, এক্ষেত্রে বাতাস ও জল, প্রতিফলিত আলোকরশ্মির কোণের পরিমাপ দুই রকম হবে। যদিও দেকার্তেই প্রথম প্রবন্ধাকারে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, তত্ত্বটি অনেক বিজ্ঞানী মহলে স্নেলের নামে প্রচলিত ছিল। স্নেল কোনো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নি। তবুও দেকার্তের সূত্র স্নেলের সূত্র নামেই প্রচারিত হয়। তাই কালেসকি আর কেইনস যে একই ধরনের তত্ত্ব স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন তা একেবারে আশ্চর্যজনক বলা যায় না।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এর পরও থেকে যায়। বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারেই দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা সকলেই বিজ্ঞানের কতগুলি সাধারণ সূত্র মেনে নিয়েই গবেষণা করে থাকেন। যেমন বেতার বিষয়ক গবেষণা হয়েছিল হার্জ-এর ক্ষেত্রের (Hertzian field) ধর্ম অনুসরণ করেই। দেকার্তে এবং স্নেল আলোকের প্রতিফলনের সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করেই তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে যে সিদ্ধান্তগুলিতে কেইনস পৌঁছেছিলেন, বুর্জোয়া তত্ত্ব অবলম্বন করে একই ধরনের সিদ্ধান্তে কালেসকি পৌঁছেছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মার্কসবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে। কালেসকি আর কেইনসের মধ্যে শুধু যে

অর্থনীতিশাস্ত্রের কোনো স্বীকৃত সাধারণ সূত্র ছিল না তাই নয়, তাঁরা দুজনে অর্থনীতিশাস্ত্রের দুটি বিপরীত ধারার প্রতিভূ ছিলেন। কেইনস মার্কসীয় অর্থনীতির ধার ধারতেন না; বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রচলিত ধারা, বিশেষ করে মিলস আর মার্শালের ধারা ছিল কেইনসের অধীত বিষয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, মার্কস অর্থনীতিতে যে পূর্বসূরীদের দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মিলস তাঁদের একজন। অন্যদিকে, কালেসকির সমস্ত শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল মার্কসীয় অর্থনীতির মধ্যে। পোল্যানডের ওয়ারশ এবং জিদানস্কের পলিটেকনিকে তাঁর পাঠক্রম তিনি শেষ করতে পারেন নি সংসারে আর্থিক দুরবস্থার জন্য। ওই সময়েই তিনি মার্কসীয় অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর রচনাগুলিতে বুর্জোয়া অর্থনীতিতত্ত্বের কোনো প্রভাব দেখা যায় না। বিস্মিত হতে হয়—কী করে এইরকম দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান থেকে কেইনস এবং কালেসকি একই কেন্দ্রে পৌঁছোলেন। এ যেন দুটি বিপরীতধর্মী কম্পাস হাতে উত্তর আর দক্ষিণ মেরু থেকে যাত্রা করে দুই পর্যটক বিষুবরেখার একই দিকে মিলিত হলেন। বিজ্ঞানজগতে এ ধরনের কোনো উদাহরণ পাওয়া কঠিন।

কালেসকির মৌলিক প্রবন্ধগুলি মার্কস আর তাঁর উত্তরসূরীদের চিন্তাকে ভিত্তি করে রচিত। এখন প্রশ্ন করা যায়: যদি ধনতন্ত্রের জটিলতম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ সফলভাবে মার্কসবাদী তত্ত্ব থেকে করা সম্ভব হয়, তাহলে আধুনিক যুগে মার্কসবাদ অচল হল কী করে? কেইনস তিরিশের দশকে ধনতন্ত্রের সংকটের আশু সমাধানের কথা চিন্তা করেছিলেন। কেইনস ধনতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার প্রশ্ন বিবেচনা করেন নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল আশু সমস্যার প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান। সেইদিক থেকে কেইনসের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হয়েছিল। কিন্তু কেইনসীয় সমাধান সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য নয়। তা দেখা গেল সত্তরের দশকে বিশ্বধনতন্ত্র যখন বড়ো রকম সংকটের মধ্যে পড়ল। পাশ্চাত্য জগতে ভিন্নমতালম্বী অর্থনীতিবিদরা, যাঁরা মুদ্রা প্রচলনের তত্ত্ব কেন্দ্র করে চিন্তা করেন, monetarist school, রাষ্ট্রের ভূমিকাকে উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র পথে এর সমাধানের উপায় স্থির করলেন। সাময়িকভাবে তাতে কিছু ফল মিললেও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলি পরবর্তী কালে বেড়েই গেল। এও ঠিক, কেইনসের তত্ত্বের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সংকট-উত্তরণ এক দীর্ঘ সময় সম্ভব হল, পরবর্তী কালে তা আর সেভাবে কার্যকর হল না।

মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ কালেসকি তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক সংকটকে কোনো সাময়িক সমস্যা বলে মনে করেন নি। ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্যে পর্যায়ক্রমে অর্থনীতির যে ওঠা-পড়া, যাকে বলা হয় business cycle বা বাণিজ্য-চক্র, কালেসকির মতে সেগুলি একটির থেকে অপরটি বিচ্ছিন্ন নয়; এগুলি যেন একটি অখণ্ড শৃঙ্খলের অংশবিশেষ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এর ধারাবাহিকতা গাঁথা রয়ে গেছে, তার অন্তর্নিহিত রহস্য অর্থনীতিশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হওয়া উচিত। কালেসকির বাণিজ্য-চক্র সংক্রান্ত রচনাগুলি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণে নতুন পথের দিশারি হয়ে আছে। এইখানে কালেসকি কেইনসকেও অতিক্রম করে যান।

কালেসকি মার্কসের কোন্ সূত্র ধরে বস্তুত যুগান্তকারী বিশ্লেষণে পৌঁছোলেন, কিভাবে মার্কস আর তাঁর উত্তরসূরীদের রচনা থেকে কালেসকি তাঁর চিন্তার খোরাক পেয়েছিলেন, তা বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সৌভাগ্যের বিষয় মার্কস, কালেসকি আর কেইনসের চিন্তার মধ্যে যোগসূত্রটিকে ইতিমধ্যেই সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *Macro Economics: The Dynamics of Commodity Production* গ্রন্থটিতে।

কেইনসের তত্ত্বে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের বিশেষ ভূমিকা আছে। বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট

উৎপাদনযন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ সময় তার ব্যবহার কতটা করা যাবে, তা আগে থেকে নিশ্চিত করা যায় না। এই অনিশ্চয়তা মেনে নিয়েই বিনিয়োগকারীরা অগ্রসর হন। শিল্পপতিরা যথেষ্ট হিসাবনিকাশ করে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগের বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ভোগ্যপণ্যক্রয়ের সিদ্ধান্তের মতন তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে করা হয় না। কেইনস তাঁর বিশ্লেষণ আপেক্ষিক অর্থে অল্প সময়ের মধ্যে (short term analysis) সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। যেহেতু বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্রভাবে পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে, তাই বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়ে আছে ধরে নিয়েই তিনি আলোচনা করেন।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর। অথচ বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নতি। বিনিয়োগের হারের উপর নির্ভর করে একদিকে সমাজে উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধির হার এবং নতুন শ্রমের সৃষ্টির হার; অন্যদিকে বিনিয়োগের ফলে শ্রমিকদের মজুরি এবং ধনিকশ্রেণীর যে মুনাফা বৃদ্ধি পায়, তার থেকে সৃষ্ট হয় ভোগ্যপণ্যের জন্য অতিরিক্ত চাহিদা। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য তখন প্রয়োজন হয় অধিক সংখ্যায় শ্রমিকনিয়োগের এবং আরো বিনিয়োগের। পক্ষান্তরে, যদি যথেষ্ট চাহিদার অভাবে উপস্থিত উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা না যায়, তবে শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস করে সংকট সমাধানের পথ খোঁজা হয়। এদিকে শ্রমিকের মজুরি-হ্রাসের ফলে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা আরো হ্রাস পায় এবং সংকট তীব্রতর হয়। কেইনসের মতে, এই অবস্থায় নতুন বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে আয় এবং চাহিদার বৃদ্ধি সম্ভব হবে। কিন্তু এই অবস্থায় ধনিকশ্রেণী ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে আদৌ ইচ্ছুক নয় দেখা যায়; তাই কেইনস প্রস্তাব করেন যে রাষ্ট্রই উদ্যোগ নিয়ে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করুক।

কেইনসের এই বিশ্লেষণ মার্কসের তত্ত্বগত ছকের থেকে কিভাবে সহজেই পাওয়া যায়, তা অমিত ভাদুড়ী অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে দেখিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। মার্কসই প্রথম ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদনব্যবস্থাকে দুটি বিভাগে, বা দপ্তরে, বিভক্ত করেন। প্রথম বিভাগে (Department I) প্রস্তুত করা হয় উৎপাদনযন্ত্র এবং দ্বিতীয় বিভাগে (Department II) ভোগ্যপণ্য। এই ব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণী, যারা উভয় বিভাগের উৎপাদনযন্ত্রের মালিক, মুনাফা হিসাবে যা আয় করে তার একটি অংশ ব্যয় করে ভোগ্যপণ্যের জন্য; আর অপর অংশ, যা সঞ্চয় হয়, তার থেকেই বিনিয়োগ করা হয়। দুটি বিভাগে নিযুক্ত শ্রমিকরা যে মজুরি আয় করে মনে করা যায়, তার সবটাই ব্যয় হয় প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য। উৎপাদনের থেকে শ্রমিক ও ধনিকশ্রেণী যে আয় অর্জন করে তার সবটাই যদি প্রয়োজনীয় অনুপাতে ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদনযন্ত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হয়, তাহলে উৎপাদনের চাহিদা ও যোগান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা থাকবে। এই ধরনের সমতা অর্জন করতে পারলে ধনতান্ত্রিক সংকট এড়ানো যায়। উৎপাদনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যখন মজুরি আর মুনাফা এমন স্তরে পৌঁছায় না যাতে দ্বিতীয় বিভাগে প্রস্তুত ভোগ্যপণ্য সবটাই বিক্রয় হয়। এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় প্রথম বিভাগে যখন শিল্পপতিরা আর নতুন উৎপাদনযন্ত্র ক্রয় করতে আগ্রহী হন না। উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা আর যোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলে সূত্রপাত হয় ধনতান্ত্রিক সংকটের।

মার্কসের ছক থেকে এই ব্যাখ্যা প্রথম করেন কালেসকি ১৯৩৩ সালে পোলিশ ভাষায় *Essays on the Theory of Business Cycles* প্রবন্ধে। ইংরাজি ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। কালেসকি প্রথম বিভাগের নেতৃত্বমূলক ভূমিকার আলোচনায় দেখান যে, প্রথম বিভাগে

যা উৎপাদন হয় তা উৎপাদনবৃদ্ধিরই কাজে লাগে। কাজেই সমগ্র অর্থনীতির উৎপাদনের ক্ষমতা এবং উৎপাদনের হারবৃদ্ধি নির্ভর করে প্রথম বিভাগের প্রসারের উপর। প্রথম বিভাগের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় হওয়ার অর্থ সমান পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়া। যদি কোনো কারণে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হয়, তাহলে সেই পরিমাণ উৎপাদনযন্ত্র অবিক্রীত থাকবে। পরবর্তী কালে প্রথম বিভাগের উৎপাদন কমাতে হবে; ফলে শ্রমিকের মজুরি আর মালিকের মুনাফাও কমে যাবে। এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা যাবে দ্বিতীয় বিভাগে প্রস্তুত ভোগ্যপণ্যও অবিক্রীত থাকছে। এইভাবে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটা নিম্নগতিচক্রের মধ্যে পড়বে। তিরিশের দশকে এমনি এক সংকটের সময় কেইনস প্রস্তাব করেছিলেন বিনিয়োগের এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য রাষ্ট্র যদি নিজেই বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

কেইনসের প্রস্তাব সমসাময়িক অর্থনীতিবিদদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়। কারণ, প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রে ধনতন্ত্রের ধর্মই হল ব্যক্তিগত উদ্যোগ; একমাত্র স্বাধীন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই তার বিকাশ সম্ভব। এই বিচারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদরা প্রায় সমস্বরে তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করতে কেইনসকে যে দীর্ঘ এবং তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তার ব্যাপকতায় বিক্ষুব্ধ কেইনস কালেসকির কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে নিউটনের তত্ত্বও প্রাথমিক পর্যায়ে ৪০ বৎসরের বেশি বয়স্করা বুঝতে পারেন নি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদদের চিন্তার অচলায়তন কত সুদৃঢ় ছিল তা জানা যায় কেইনসের অন্যতম শিষ্যা জোন রবিনসনের একটি মন্তব্য থেকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—কালেসকি ১৯৩৬ সালে তাঁর নতুন তত্ত্ব নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সময়ে প্রকাশিত হয় কেইনসের গ্রন্থ *General Theory of Employment, Interest and Money*। গ্রন্থটি পাওয়ামাত্র কালেসকি তাঁর লেখার কাজ বন্ধ করে দেন এবং সোজা পাড়ি দেন কেমব্রিজে কেইনসের কাছে। কেইনসের সহকর্মী হিসাবে দীর্ঘকাল তিনি কেমব্রিজে ছিলেন। কালেসকি যে তত্ত্ব আবিষ্কারে তাঁর অগ্রাধিকার দাবি করেন নি সেটা শুধু বিদগ্ধজনোচিত অসাধারণ নম্রতারই পরিচায়ক নয়, এ বিষয়ে তাঁর নিজের যুক্তিও চমকপ্রদ। রবিনসন বলেন, কালেসকি মনে করতেন কেইনস ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত না। কেইনসের প্রতিভার প্রভাব ছিল বহুদূর বিস্তৃত, তীক্ষ্ণ তাঁর বিতর্কশক্তি। সর্বোপরি তিনি নিজে ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর মানুষ; আর আক্রমণ করেছিলেন রক্ষণশীল চিন্তাধারাকে। আর কারো পক্ষে এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ করা দুরূহ হত।

কেইনস মনে করতেন, ধনতন্ত্রের সংকটের মূল কারণ যে উপযুক্ত পরিমাণ বিনিয়োগের অভাব তা তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এ বিষয়ে তাঁর যে আত্মপ্রত্যয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় বার্নার্ড শ'কে ১৯৩৫ সালে লেখা তাঁর চিঠিতে। তিনি লেখেন যে তিনি যে গ্রন্থটি রচনা করছেন তা অর্থনীতির চিন্তাধারায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। তাঁর নতুন তত্ত্বের পর মার্কসবাদীদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে কেইনস আর কালেসকির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল মৌলিক। কালেসকির মতে, ধনতান্ত্রিক অবস্থায় উৎপাদনের ওঠাপড়া বা বাণিজ্যচক্র কোনো সাময়িক ঘটনা নয়। কেইনসীয় বিধান এর সাময়িক প্রতিশম করতে পারে মাত্র; কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন না হলে বাণিজ্য-চক্রের ধারাবাহিকতা থেকে পরিত্রাণ নেই।

মার্কসের তত্ত্ব অনুসরণ করেই কালেসকি ধনতন্ত্রের সংকটের অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি অনুসন্ধান করেন। এ বিষয়ে তিনি সাহায্য পেয়েছেন মার্কসের উত্তরসূরী রোজা লাকসেমবার্গের কাছে। রোজা লাকসেমবার্গ এবং কালেসকি তাঁদের সৃজনশীল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মার্কসীয় অর্থনীতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। লাকসেমবার্গই প্রথম দেখান—মার্কসের দুটি বিভাগের বৃদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য সব সময়ে রাখা সম্ভব নয়। ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় অর্থনীতিতে কোনো সময়ে বিনিয়োগের সুযোগ নাও থাকতে পারে। লাকসেমবার্গের মতে, তখন দেশের অভ্যন্তরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে, যেমন ব্যক্তি-মালিকানার কৃষিতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে অথবা বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই অসামঞ্জস্য দূর করা যায়। বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লাকসেমবার্গের মত অনুসরণ করে কালেসকি পর্যায়ক্রমে বাণিজ্যচক্রের ধারার কারণ বিশ্লেষণ করেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য কালেসকির বিশ্লেষণ আজও সময়োপযোগী।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই রাষ্ট্রের উদ্যোগে বিনিয়োগের প্রস্তাব কেইনস করেছিলেন মন্দার অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ধনতন্ত্রেরই স্বার্থে। কেইনসের পরামর্শ শেষ পর্যন্ত ধনিকশ্রেণী গ্রহণ করলেও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে তাঁরা অবিশ্বাসের চোখে দেখেন। ব্যবসায়ে মন্দার সময়ে তাঁরা রাষ্ট্রের বিনিয়োগের সুফল সদ্ব্যবহার করেন ঠিকই; কিন্তু যখন ব্যবসায়ে মন্দা কাটিয়ে তাঁরা নিজেদের অবস্থা সামলে নেন, তখন রাষ্ট্রের অধীন সংস্থাগুলি তাঁদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ধনিকশ্রেণীর কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে; কারণ এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে তার চাকুরির নিরাপত্তা ও মজুরির হার উপযুক্ত স্তরে নিশ্চিত করতে পারে। দুটি বিষয়ই ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্পের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যচক্রের ওঠাপড়ার মতন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সম্পর্কে ধনিকশ্রেণীর মনোভাবেরও এই ওঠাপড়াকে কালেসকি "রাজনৈতিক বাণিজ্য-চক্র" (political business cycle) বলে অভিহিত করেন। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষে অধুনা যে শক্তিশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক স্বাধীন ব্যবসায়ের তত্ত্বের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে আক্রমণের উদ্যোগ নিয়েছেন তা এই ধরনের রাজনৈতিক বাণিজ্য-চক্রেরই প্রতিফলন। স্মরণ করা যেতে পারে স্বাধীনতা অর্জন করার আগেই ১৯৪৪ সালে ভারতবর্ষের বৃহৎ মূলধনী-গোষ্ঠী স্বাধীন ভারতের নতুন সরকারের বিবেচনার জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যা "বোম্বাই প্ল্যান" নামে পরিচিত, তাতে রাষ্ট্রকেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃহৎ শিল্পগুলিতে বিনিয়োগের জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় যে শিল্পনীতি গৃহীত হল তাতে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শিল্পগুলি রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে বলা হল। ভারতবর্ষের ধনিকশ্রেণী তখন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সম্পর্কে তুষ্টীম্ভাব অবলম্বন করেন; কারণ তখন দেশের শিল্পায়নের জন্য যে বিপুল সম্পদের প্রয়োজন তা তাঁদের হাতে ছিল না। আজ তাঁদের নিয়ন্ত্রণে সম্পদের বহর অনেক বেড়েছে। এখন তাঁরা মনে করছেন পুরো অর্থনীতির দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে তাঁরা নিজেরাই বহন করতে পারবেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিকে সমর্থন করবেন ততক্ষণই যতক্ষণ তাঁর নিজের স্বার্থে বাজারের মন্দার অবস্থা কাটাবার বা বাজার আরো প্রসারিত করবার দরকার হবে। অন্য সময়ে তাঁর আর রাষ্ট্রকে প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত ধনতন্ত্রের এই বাণিজ্য-চক্র থেকে পরিত্রাণ নেই। তাই সাময়িক বিরতির পর অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে রাষ্ট্রকে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসতে বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দীর্ঘ সময় ধরে ধনতন্ত্রের যে অগ্রগতি হয় তার থেকে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে ধনতন্ত্র তার সংকট কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সংকটের তীব্রতা বারবার প্রকট হয়ে ওঠে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত, চীন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজবাদী দেশগুলি এই ধরনের বাণিজ্যচক্রের আবর্তে পড়ে নি, তার কারণ সেখানে রাষ্ট্রের হাতে ছিল সময়োপযোগী বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনার দায়িত্ব। অথচ সমাজবাদী দেশগুলির বিপর্যয়ের জন্য অনেকে শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ-নীতিকেই দায়ী করেন। এই সমালোচনা সঠিক নয়। আসলে এখানে বিচার্য হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প উৎপাদনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে নি।

আমরা দেখতে পাই: বাণিজ্যচক্রের আবর্তে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের দায়িত্বগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে একই সিদ্ধান্তে এলেন দুই সমাজবিজ্ঞানী কেইনস এবং কালেসকি বুর্জোয়া ও মার্কসীয় দুটি বিপরীতমুখী ভাবধারাকে অবলম্বন করে। দেখা গেল, ধনতন্ত্রের সমস্যাগুলির বিশ্লেষণে কেইনসের মতবাদ যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি প্রাসঙ্গিক মার্কসীয় চিন্তাধারা। কেইনস-উত্তর ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি বোঝার পক্ষে কালেসকির প্রদর্শিত বাণিজ্যচক্রের বিশ্লেষণ আজও অপরিহার্য।

মন্তব্য: শ্রীনীহার চক্রবর্তী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে সাহস পেয়েছি দুরূহ বিষয়টি নিয়ে বাঙলায় লিখতে। প্রবন্ধটি লেখার সময়ে কয়েকটি বিষয়ে ড. অমিত ভাদুড়ীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। তার জন্য কৃতজ্ঞ আছি। প্রবন্ধটিতে মতামতের জন্য অবশ্য লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী।

সূত্রনির্দেশ

লেখার কাজে নিম্নলিখিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে।

1. A Bhaduri : Macroeconomics : The Dynamics of Commodity Production. Macmillan, London and Delhi 1986.
2. A. J. Crombie : Descrates. Scientific American. October 1959.
3. G. Feiwel : Notes on the Life and Work of Michael Kalecki in the Last Phase in the Transformation of Capitalism by M. Kalecki. pp 7-58.
4. M. Kalecki : Studies in the Theory of Business Cycle, 1933-1939, Basil Blackwell. Oxford 1967.
5. M. Kalecki : The Last Phase in the Transformation of Capitalism. Monthly Review Press. New York. 1972.
6. J.M. Keynes : The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan. London 1936.
7. T.Kowalik : 'Biography of Michael Kalecki' in Problems of Economic Dynamics and Planning. Essays in Honour of Michael Kalecki, Pergamon. London 1966. pp 1-12.
8. J. Robinson 'Kalecki and Keyness' in Problems of Economics and Planning. Pp 335-341.
9. M. Sawyer : The Economics of Michael Kalecki. Macmillan, London. 1985.

ড. দেবকুমার বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং লনডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ পি. এইচ. ডি.। কিছু সময় তিনি আমেরিকায় আয়োয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক দেবকুমার বসু ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে অবসর গ্রহণের পর অবৈতনিক পরিদর্শক হিসাবে সংস্থাটির সাথে যুক্ত আছেন। তিনি রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান।

রোগা মেঘ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মোষের বাঁকানো শিং-বেঁধা ঐ রোগা মেঘটুকুই ছিল
আমার চাঁদমারি।
স্বপ্নের তিন কোয়ার্টার পেরিয়ে যাওয়ার পর
ওর নাগাল পাই আমি।

ঐ রোগা মেঘের ছোট্ট বুক ভরে ছিল ধারাপাতের অভিমান,
মাঝে মাঝেই ও তুলে ধরছিল
দেড় মাসের মেয়ের মরা মুখ,
হাজা-মজা বিলের কালচে সবুজ
আর খলশে মাছেদের গোপন খবরাখবর।

রোদের ভেতর দিয়ে যতই ছুটছিল
গলতে-গলতে আরও এত্তোটুকুন হয়ে যাচ্ছিল রোগা মেঘ।
তিন কোয়ার্টার স্বপ্ন উজিয়ে
যখন শেষমেশ ওর নাগাল পেলাম,
দুই করতলে তুলে ধরলাম ওর ক্লান্ত মুখ,
দেখি,
আমার তালুময় শুধু শিশির আর শিশির আর শিশির···

ভারতবর্ষে

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

গাছের ছায়ায় বোসো
হিন্দু হও মুসলমান হও
গ্রীষ্মদিনে গাছ দেখো ঠাণ্ডা হাওয়া দেবে
ছাতার বিকল্প হয়ে জেগে থাকবে বর্ষায় ঠিকঠাক···

এখন নদীর কাছে এসো
বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টান
নদী মুখ ফেরাবে না জল দেবে সমান সমান
জাতপাত মানুষের থাক

কে যায় ওখানে বনে
ঘুঙুর রয়েছে পায়ে তার
ছায়া দেখবে না বলে তুমি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছ
পাখি কিন্তু লক্ষ করছে তোমার এমন ব্যবহার
একটু পরে থুথু ফেলবে মাথায় তোমার

আমার কথায় তুমি কান দাও অথবা না দাও
এসো একসঙ্গে বনে গাছের ছায়ায়
অথবা নদীর কাছাকাছি
চলো আমরা এইভাবে আরো-আরো কিছুদিন বাঁচি···

একটি ম্লান বিন্দুর দিকে—

পার্থপ্রতিম মণ্ডল

এই সেই মৃত্যুর দেশ—
আমি আজন্ম বিস্মরণের অতলে, সুপ্তির অতলে তবুও
আমার চোখে ভাঙা-ভাঙা ঝলকে ওঠে
সেই গ্রন্থিমোচন…শূন্যতার সাথে আমার সখ্যতার
দিনগুলি—আমি এখনও শূন্যতার মোহে
ছুটছি—আমি জানি না—বড্ড নাবাল এ ভূমি…
অথচ মনে হয় আমি কোথাও উঠছি না, নামছিও না
হাওয়ার ভিতরে স্থাণু—নক্ষত্রের মতো নয়, অদৃশ্য আত্মার মতো
এভাবে অপেক্ষা করা যতদিন না
সৌদামিনী ঝলসে আমাকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে যায়…

এই সেই কুরুক্ষেত্র
সতেজ লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে
আমি ঠিক স্থাণু হয়ে বসে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র…
নাকি চোখ-উপড়ানো নিজহাতে!
…বৃদ্ধ তেইরেসিয়াস তুমি রাজসভায় একটি হত্যাকাণ্ডের
বিবৃতি দিয়েছিলে—সত্য বাতলে দেওয়া তোমার অসাধ্য ছিল
বলো বলো বলো অন্ধ রাজা
নিজহাতে আলোকবর্জনের সাহস আমার নেই
অন্ধকার নয়—বলো—কিভাবে সহসা জ্বলে উঠবে
ফুলের আগুন…কোন্ কল্পভূমিতে আমাকে নিয়ে
যেতে চাও তুমি…

দু-শ হাজার বছর আমি এই
নির্বীজিত টিলার ওপর নির্বাসিত করেছি নিজেকে
বন্ধনহীন অথচ খসে পড়ছি না আমি
আমার প্রোথিত কোনো মূল নেই অথচ ভাসমান নই

দু-শ হাজার বছর আমি নির্বাসিত করেছি নিজেকে
নক্ষত্রের মতো নয়, অদৃশ্য আত্মার মতো—
আমাদের ভিতর কেউ একজন গিয়েছিল
সমুদ্রের দিকে অরণ্যের দিকে একজন
খুব বেমানান দেখাচ্ছিল একজনকে—দূর থেকে তাকে
মনে হচ্ছিল ভেসে-আসা খড়কুটো

আরেকজন ডুবে গেল সবুজ অন্ধকারে…
আমার দুপাশে দিগন্ত ছুঁয়ে রয়েছে আকাশ
তার আদিমতার আড়ালে আমি ক্রমশ
হারিয়ে যেতে থাকি—
অবশেষে—মনে পড়ে আমার—আমি আজন্ম
বিস্মরণের অতলে, সুপ্তির অতলে, তবুও
একটি ম্লান বিন্দু হয়ে—নক্ষত্রের মতো নয়, অদৃশ্য
আত্মার মতো…

পাশাপাশি আছে

কালী মোহান্ত

শব্দের গভীরে স্তব্ধতা, নিস্তব্ধতা ভরে বাক্যালাপ— ;
শঙ্খেতে সমুদ্রোচ্ছ্বাস—

আমরা চলেছি কোথায়! দ্রুত যায় যানবাহন
মানুষও মিছিল, পশ্চাদপদ ধুলো, ছায়া আত্মবীক্ষণ ;
ধুলোতে রয়েছে চিহ্ন, অভিজ্ঞতা, বীজও রয়েছে—
শস্যশ্যামলা হবে, সুসময়ে পেলে বর্ষণ

আমরা চলেছি পথে, পিছনেতে ফেলে—
ভুল, ভাঙাকলসি, প্রভূত শ্মশান···
শব্দ ভেঙে নিস্তব্ধতার আরো গভীরে—
মৃত্যু, প্রসূতিগৃহ, জীবন পেরিয়ে—

যেখানে, অনাদি জিজ্ঞাসা—
অনন্ত সমাধানে ; পাশাপাশি আছে ॥

রাজনীতি ও পূর্ববঙ্গের কবিতা : সম্পর্কের কার্যকারণ

অশ্রুকুমার সিকদার

অশ্রুকুমার সিকদারের জন্ম ১৯৩২ সালে। অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন ১৯৫৫ সাল থেকে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। অধ্যাপক সিকদার-লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে "আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়", "বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ", "আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস" ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এক

একটু বিভ্রান্তিকর অর্থে হলেও, পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির পিছনে ছিল আদতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি। মুসলমানের হিন্দু-প্রভুত্বের ভয়ের মধ্যে নিহিত ছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কারণ। পাকিস্তান পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে যেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হল ও হিন্দু-আধিপত্যের ভয় দূর হল, অমনি পাকিস্তান-মতবাদের, দুইজাতি-তত্ত্বের ভ্রান্তি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। দেখা গেল শুধুমাত্র ইসলামের বন্ধনে বেঁধে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করা যায় না। পাকিস্তান-রাষ্ট্রের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই জিন্না ব্যক্তিগত জীবনে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক হয়েও ধর্মীয় উন্মাদনাকে ব্যবহার করেছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়োজনে। আর পাকিস্তান-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠামাত্র তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলে কী হবে, যে-দৈত্যকে তিনি বোতলের বাইরে এনেছিলেন সে আর বোতলের ভিতরে ঢুকতে রাজি হয় নি। ধর্মই হল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে একমাত্র সংযোগ। কেউ-কেউ ঠাট্টা করে বলেছেন, দ্বিতীয় সংযোগসূত্রটি ছিল পাকিস্তান এয়ারলাইন্‌স্! পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ববঙ্গের মধ্যে হাজার মাইল ভারত-ভূখণ্ড ; এই নবজাত রাষ্ট্রকে বলা হয়েছিল 'geographical monstrosity'। এই দুই অংশের জাতিগত চরিত্র একেবারে ভিন্ন ; ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্য, আবহাওয়া, ভূগোল, প্রাণিগত ও উদ্ভিদগত সম্পদ পৃথক। পৃথক পোশাক, পঞ্জিকা, মান-সময় ; সবচেয়ে পৃথক—ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

১৯৪০ সালের যে লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তান-পত্তনের ভিত্তি, তার মধ্যেই দুই অংশের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি ছিল। সেখানে মুসলমান-প্রধান একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক

আবুল হাশিম বহুবচনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, জিহ্বা ধমক দিয়ে বলেন, ওটা ছাপার ভুল। ছাপার ভুল যে হতে পারে না তা চৌধুরি খলিকউজ্জমান তাঁর স্মৃতিকথায় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। লাহোর-প্রস্তাব মুসলিম লীগের আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়, যতবার লীগের গঠনতন্ত্র ছাপা হয়েছে ততবারই 'state' নয় 'states' ছাপা হয়েছে। সে যাই হোক, গোড়া থেকেই পাকিস্তান-আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বাঙলার নেতৃত্বের স্বাধিকারের প্রশ্নে একটা বিরোধ ছিল। অমলেন্দু দে "পাকিস্তান-প্রস্তাব ও ফজলুল হক" বইতে দেখিয়েছেন, মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ফজলুল হকের সঙ্গে অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কোনো-কোনো বিষয়ে মিল থাকলেও, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য ছিল। ১৯৩৭ সালে লখনউতে জিন্নার সঙ্গে ফজলুল হকের একটা সমঝোতা হয়, হক সাহেবই লীগের ১৯৪০ অধিবেশনে লাহোরে পাকিস্তান-প্রস্তাব পেশ করে ঘোষণা করেন, 'I am a Muslim first and Bengali afterwards.' কিন্তু হকসাহেব আর তাঁর অনুগামীরা বাঙালি হিসাবে তাঁদের ঐতিহ্য ও জাতিসত্তা ভুলতে প্রস্তুত ছিলেন না, বরং হিন্দু-ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে বাঙালিত্বের সমান অংশীদার বলে গর্বিত ছিলেন। পরে ফজলুল হক কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার সদস্যদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং যিনি একদা লাহোর-প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, তিনি এবার ঘোষণা করলেন, 'The Pakistan scheme could not be applied to Bengal'. দেশবিভাগের ঠিক পূর্বাহ্নে যে স্বাধীন যুক্তবাঙলা গঠনের চেষ্টা হয় তার মধ্যেও ছিল এই বাঙালি জাতিসত্তাকে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় রূপ দেবার শেষ মরিয়া চেষ্টা। কংগ্রেস ও লীগ দুপক্ষের বাধায় এবং গণসমর্থনের অভাবে এই-যে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেল, তার সঙ্গে একদিকে জড়িত ছিলেন সোহ্‌রাবর্দি, আবুল হাশিম, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ। বাঙালির জাতীয়তাবাদে প্রাণিত হয়েই ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রনটের বিপুল জয়ের অব্যবহিত পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হকসাহেব কলকাতায় এসে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে জানিয়েছিলেন, হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের প্রভেদ তিনি মানেন না।

মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে, পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের সঙ্গে, বাঙালি মুসলমানদের একটা দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্ক যেমন ছিল, তেমনি এটাও সত্য যে বাঙালি মুসলমানদের পাকিস্তান-আন্দোলনে যোগদান ব্যতিরেকে জিন্নার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত। ধনী মুসলমানেরা, মধ্যশ্রেণীর মুসলমানেরা পাকিস্তান-প্রস্তাব সমর্থন করেছিল ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে রেহাই পাবে বলে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা এই আন্দোলনে সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। যতদিন এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সমর্থন, ততদিন আন্দোলন জোরালো হয় নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পানজাবে, সিন্ধুতে লীগ-মন্ত্রিসভাও ছিল না। যখন প্রধানত হিন্দু জমিদারদের দ্বারা শোষিত বাঙলার মুসলমান ভূমিহীন কৃষক এবং ছোটো-চাষিরা পাকিস্তান-আন্দোলনের সমর্থক হয়, শোষণমুক্তির প্রত্যাশায়, তখনই পাকিস্তান-আন্দোলন যথার্থ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। তারই ফলস্বরূপ ১৯৪৬-এর নির্বাচনে বাঙলায় মুসলিম লীগ ১১৯-টির মধ্যে ১১৬-টি মুসলিম আসনে নির্বাচিত হতে পারে। বাঙলার মুসলমানদের এই বিপুল সমর্থনের স্বীকৃতি হিসাবেই ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে মুসলিম লীগ বিধায়কদের সম্মেলনে পাকিস্তান-প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাঙলার প্রতিনিধি সোহরাবর্দিকে।

কিন্তু পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার সামান্য দিনের মধ্যেই পাকিস্তান-বিষয়ে পূর্ববঙ্গের মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করে। তারা ভেবেছিল জমিদারের শোষণ থাকবে না, চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নামতে হবে না; ভেবেছিল মুসলমান যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ তেমন স্বাধীন দেশ হলে নিজেরাই হবে নিজেদের ভাগ্যবিধাতা। হিন্দুদের আধিপত্যের পরিবর্তে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য চায় নি। অথচ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকল পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, প্রশাসনে, পূর্ববঙ্গ নিজের প্রাপ্য থেকে, স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত হল। ভূমি-সংস্কার বা বেকারি-দূরীকরণের ব্যবস্থা হল না। হিন্দু জমিদার ও হিন্দু বৃত্তিজীবী মানুষেরা ভারতে চলে যাওয়ায়, নবোদ্ভূত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেল বটে, হিন্দুদের চলে যাওয়ার শূন্যতা প্রধানত পূরণ করল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত বণিক ও রাজকর্মচারীরা। পশ্চিমের শিল্পপতিরা পূর্ববঙ্গকে তাদের উৎপন্ন পণ্যের বাজার মনে করত। উদ্ধত জাতিগর্বী এই পশ্চিম-পাকিস্তানিরা নিচু-নজরে দেখত পূর্ববঙ্গের মানুষকে। তাদের দায়িত্বশীল পদের যোগ্য মনে করত না। তারা অবজ্ঞা করত পূর্ববঙ্গের মানুষের সংস্কৃতিকে, জীবনাচরণকে। তাদের যথার্থ মুসলমান বলেও মনে করত না। বাংলাদেশে যুদ্ধ চলাকালীন সাংবাদিক আনটনি মাসকারেনহাসকে জনৈক পশ্চিমী মেজর যা বলে, তা থেকে বাঙালি মুসলমান সম্বন্ধে তাদের মনোভাব বোঝা যায়: This is the war between the pure and the impure. The people here may have Muslim names and call themselves Muslims. But they are Hindus at heart'. এইসব কারণেই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই এমন কথা সচেতন বাঙালিদের মধ্যে উচ্চারিত হতে শুরু হল যে, পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক জরিপ থেকে দেখা যায় পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে কতটা বৈষম্য ছিল। বাজেটের ব্যয়বরাদ্দের চার-পঞ্চমাংশ খরচ হত পশ্চিম পাকিস্তানে। পাটের দৌলতে পূর্ববঙ্গ বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করত বেশি, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা ও সাহায্য পূর্ব-বাঙলার তুলনায় দুই-তিন গুণ বেশি ব্যয় হত পশ্চিমাঞ্চলে। ১৯৬৯ সালে ইকাফের জরিপ অনুসারে পূর্ববঙ্গে মাথাপিছু আয় ছিল ৩০০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ৫০০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্বের তুলনায় ১৯ গুণ বিদ্যুৎ, ৬ গুণ সিগারেট, ৩ গুণ কাপড়, ২ গুণ কাগজ ও কয়লা ব্যবহার করে। ১৯৬৬ সালের হিসাবে পূর্বে হাসপাতালের শয্যা-সংখ্যা ছিল ৬৯০০, পশ্চিমে ২৬২০০। উচ্চপদের সরকারি চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা ছিল নগণ্য। সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বাঙালি ছিল না বললেই চলে; উচ্চতম থেকে শুরু করে কর্নেল পর্যন্ত পদ-মর্যাদায় যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি ১০৬ জন, যেখানে বাঙালি ২ জন। বৈষম্যের আরো অগণিত উদাহরণ উপস্থিত করা যায় সহজেই। এইসব কারণে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে জনৈক বাঙালি সদস্য প্রশ্ন করেন, 'How long would you exploit East Bengal in the name of Islamic brotherhood and solidarity?'

১৯৫৪ সালে প্রমাণ হয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকারের তথা পশ্চিমী রাজনীতিবিদ্-সমরনায়ক-শিল্পপতিদের যৌথ আক্রমণের কাছে বাঙালির অসহায়ত্ব। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রনট মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটায়, যে মুসলিম লীগ ছিল পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি শাসকবর্গের অনুচর। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রনট জেতে ২২৩টি আসনে। কিন্তু ১৯৫৪ সালেই পরিকল্পিতভাবে অবাঙালি শিল্পপতির মদতে বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা লাগানো হয়। হকসাহেব বামপন্থী দলগুলিকে নিষিদ্ধ করতে রাজি না হওয়ায় এবং এই দাঙ্গা ও কলকাতায় তাঁর আবেগময় বক্তৃতাকে অছিলা করে হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয়। গভর্নরের শাসনের

নামে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন চালু করা হয়। যিনি একদা লাহোর-প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তাঁকে বলা হয় বিশ্বাসঘাতক, 'fundamentally disloyal to Pakistan'। এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে যায় পূর্ববঙ্গের মানুষের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটাই তুচ্ছ পশ্চিমী শাসক ও তাদের তাঁবেদারদের কাছে।

পূর্ববঙ্গের মানুষের দুঃখদুর্দশায় পাকিস্তানি রাষ্ট্র-নায়কদের ও আমলাদের হৃদয়হীন উপেক্ষাও ক্ষোভ সঞ্চারের অন্যতম কারণ। ১৯৪৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বেগের কোনো প্রমাণ মেলে নি। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় যখন দুর্ভিক্ষ লাগে তখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ খান শুধু যে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করেন নি তাই নয়, তিনি দুর্ভিক্ষ ও প্রাসঙ্গিক সমস্যা নিয়ে মৌলানা ভাসানির আলোচনার অনুরোধকে অগ্রাহ্য করেন। ১৯৬০ ও ১৯৬৬ সালের ঘূর্ণিঝড়ে হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। তার পরেও এইজাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ১৯৭০ সালের ১২ নবেমবর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দুই লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় পূর্ব-বঙ্গে। মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ থেকে বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও কোনো আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, পরে উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যাপারেও সংগঠিত সরকারি উদ্যোগের অভাব ছিল। ওয়ালি খান ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো জননায়ক এই দুর্দিনে পূর্ববঙ্গে আসেন নি। এইসব সহমর্মিতার অভাবের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৬৫ সালে কাশ্মির নিয়ে ভারত-পাকিস্তানে যখন যুদ্ধ বাধে তখন পূর্ববঙ্গে ভারতবিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও খুব একটা উত্তেজনা হয় নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বরং আশঙ্কাবোধ করে কাশ্মির পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে পূর্ববঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠতা-জনিত গুরুত্ব হারাতে পারে। এই যুদ্ধে উলটে পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয়। পূর্ববঙ্গ যুদ্ধকালে একেবারে প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় ছিল, ভারত আক্রমণ করে নি বলেই পূর্ববঙ্গ রক্ষা পায়। পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় ভারতের দয়ায় তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, এই সচেতনতা বিক্ষোভের কারণ হয় এবং প্রতিরক্ষার স্বাবলম্বনের দাবি ওঠে।

দুই

পাশাপাশি আর-একটি প্রশ্নে পূর্ববঙ্গে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুসারে বঙ্গভাষী ছিলেন ৫৪·৬% জন, আর উর্দুভাষী ৭·২% জন, তাই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বিরোধিতা দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গেরও দুই শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ছিল উর্দুর সমর্থক। প্রথম দলে ছিল তারা বাঙালি হয়েও যারা উর্দুকে মাতৃভাষা-রূপে ব্যবহার করে। এরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দ্বিতীয় দলে ছিল জো-হুজুরেরা, 'রাজনৈতিক প্রজ্ঞা-হীন ভাগ্যান্বেষীরা'। এর পিছনে ভাষার ব্যাপারে বাঙালি মুসলমানদের একটা দ্বিধার ইতিহাসও রয়েছে। ব্যবহারিক কারণে মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা বাঙলার প্রয়োজন বোধ করেছেন। কবি সৈয়দ মুলতান, কবি বদিউদ্দিন বুঝেছিলেন, বাখানি আরব ভাষা কোনো লাভ নেই, 'দেশীভাষে রচিলে বুঝিব সর্বজন'। "নূর-নামা"র রচয়িতা কবি আবদুল হাকিম শুধু ব্যবহারিক কারণে নয়, মাতৃভাষা বলেই বাঙলাকে মান্য করেছিলেন,

যে-সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীত নির্ণয় না জানি॥…
দেশীভাষা বিদ্যা যার মন না যুয়ায়।
নিজদেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়॥

উচ্চবংশীয় মুসলমানেরা সত্যই বঙ্গবাণীকে 'হিংসা'

করতেন, বাঙলায় থেকেও ছিলেন প্রবাসী। ১৮৮২ সালে নবাব আবদুল লতিফ হানটার কমিশনের কাছে বলেন আশরাফ বা সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ভাষা উর্দু, আতরাফ বা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের ভাষা বাঙলা। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় মুসলিম বাঙলা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় এই দ্বিধার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। কখনো লেখা হয়েছে, 'বাঙলাভাষা হিন্দুদিগের ভাষা।' কখনো দুঃখ করা হয়েছে, 'আমাদের বঙ্গীয় মুসলমানদের কোনো ভাষা নাই। শরিফ-সন্তানেরা এবং তাহাদের খেদমৎগারগণ উর্দু বলেন, বাংলাভাষা ঘৃণা করেন।' বাঙলা জানি না বা ভুলে গেছি বলা, উর্দু বা আরবিকে নিজেদের মাতৃভাষা বলে প্রচার করা এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ছিল। এদের বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো-কোনো পত্রিকায় বলা হয়েছিল, 'বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানগণের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে?' ১৯১৮ সালে আকরম খাঁ লিখেছিলেন, 'বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা-ভাষাই তাহাদের (অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের) লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষা।' বঙ্গভাষী সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেওয়া হল। যে-১৯৪৭ সালের নবেমবরে করাচিতে শিক্ষাসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, সেই ১৯৪৭-এর ডিসেমবরেই ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পরের বছর ফেবরুয়ারিতে কয়েক হাজার স্বাক্ষর-সংবলিত দাবিনামা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। সেই দাবি অগ্রাহ্য হয়। মুদ্রায়, ডাকবিভাগের খামে টিকিটে ফর্মে গরিষ্ঠের ভাষা বাঙলার ব্যবহার ছিল না। উচ্চ সরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষা বাঙলায় দেওয়া যেত না। এমনকী পাকিস্তান-রাষ্ট্রে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের প্রতিনিধিরা গণপরিষদে মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রথমে লিয়াকৎ আলি, পরে ঢাকায় স্বয়ং জিন্না জানিয়ে দেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেদিন জিন্নার ঘোষণার জবাবে কয়েকটিমাত্র প্রতিবাদী স্বর ধ্বনিত হয়েছিল; অচিরেই সেই প্রতিবাদ হয়ে ওঠে সারা পূর্ববাঙলার প্রতিবাদ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ১৯৩৭ সালে লখনৌ অধিবেশনে মুসলিম লীগ যখন উর্দুকে মুসলিম ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা বলে ঘোষণা করতে চায় তখনও বাঙালি সদস্যরা বাধা দিয়েছিলেন।

উর্দুর পক্ষে যুক্তি ছিল, এই ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা হলেও মুসলিম রাজনীতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ। এই ভাষা মুসলিম ভারতের প্রধান ভাষা। হিন্দি আর উর্দু নিয়ে বিরোধ ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ, তাই উর্দুর একটি প্রতীকী মূল্য আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে তো বটেই, এমনকী পূর্ববঙ্গেও সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা উর্দুকেই নিজেদের ভাষা মনে করেন। উর্দুর পক্ষে সবচেয়ে চমৎকার যুক্তি দিয়েছেন Pakistan Language Formula বইয়ের (গোটা পুস্তিকাটি বদরুদ্দীন উমরের "ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ" গ্রন্থে ছেপে দেওয়া হয়েছে) লেখক মৌলানা রাশীদ আহ্‌সান। কোন্ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে সেটা পাকিস্তানের একমাত্র মুসলমানদের 'domestic question'। হিন্দুদের মত এক্ষেত্রে একেবারেই বিবেচ্য হতে পারে না। মোট জনসংখ্যা যাই হোক, মাত্র মুসলমান জনসংখ্যার বিচারে সংখ্যাগুরু পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান। তারা যেহেতু উর্দু চায়, তাই উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। বাঙলার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি উত্থাপিত হচ্ছিল, তার একটি, বাঙলা সংখ্যাগুরুর ভাষা হলেও, এই ভাষা পূর্বপ্রদেশে মাত্র সীমাবদ্ধ। তার চেয়ে বড়ো কথা, এই ভাষা হিন্দু-প্রভাবিত 'a Brahminical creation, highly Sanskritized', মূলত হিন্দুর ভাষা, ফলত অন্-ইসলামি। বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ বাড়বে, সেটাও

পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। এইসব কুযুক্তি পূর্ববঙ্গে গ্রাহ্য হয় নি। বাঙলা ভাষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল বাঙালি জাতীয়তাবাদের, তার আত্ম-পরিচয়ের প্রশ্ন। বাঙলা সংখ্যাগুরুর ভাষা, সুতরাং বাঙালিরা সচেতন ছিলেন তাঁদের দাবি গণতান্ত্রিক। তাঁরা বুঝতে পারলেন উর্দু চাপানোর চেষ্টার পেছনে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ ও আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্য। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে মেনে নিতে হবে বাঙলা-না-জানা পশ্চিমী আমলাদের শাসন, বাঙালি পর্যবসিত হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে, বঞ্চিত হবে স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা থেকে। ১৯৪৭ সালেই মুহম্মদ এনামুল হক সতর্ক করেছিলেন, 'বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিলে, তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য।' একই সময়ে আবদুল হক লেখেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে ফল হবে অশুভ, বাঙালির বিকাশের পথ হবে অবরুদ্ধ। পাকিস্তান গণপরিষদের মৌলিক নীতি নির্ধারণ কমিটি ১৯৫০ সালের সেপটেমবরে যে মধ্যবর্তিকালীন রিপোর্ট দেয় তাতেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়। লিয়াকৎ আলির মৃত্যুর পর নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঢাকায় এসে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে ঘোষণা করেন উর্দু ই হবে রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৮ সালের ১১-১৭ মার্চেও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বাঙলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল, ঢাকা পরিণত হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮, এমনকী তারও পরবর্তী সালের ভাষা-আন্দোলন ছিল ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীর শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলন। কিন্তু ১৯৫২ সালে সেই আন্দোলন পরিণত হল গণ-আন্দোলনে। পাকিস্তানগঠনে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকের মনে শোষণমুক্তির যে-প্রত্যাশা জন্মেছিল তা ইতি-মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চোরাচালানের দরুন, অর্থনৈতিক সংকটে, দুর্ভিক্ষে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণে প্রশাসনিক প্রভুত্ব-মত্ততায়, বিক্ষোভ ধীরে-ধীরে দানা বাঁধছিল। শ্রীহট্টের বিয়ানিবাজারে, নাচোলে সাঁওতাল ও মৈমনসিংহে হাজং কৃষক-বিদ্রোহ ঘটল; ১৯৪৮-৫২ পর্বে ঘটেছে একের পর এক শ্রমিক আন্দোলন, জেলে গুলি-চালনা ও রাজবন্দী হত্যা, পুলিশ সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক, দোকানদারদের আন্দোলন। এইসব বিক্ষোভ ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণ-বিস্ফোরণে রূপ নিল। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আর বাঙলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্ন একাকার হয়ে যায়, সামনে উঠে আসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের কথা। ভাষার অধিকার ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবির সম্পর্ক ড. শহীদুল্লাহ স্পষ্ট বুঝে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, উর্দু চাপানোর চেষ্টা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতিবিগর্হিত। ভাষাকে কেন্দ্র করে শুরু হল যে আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম, তাই সার্থক রূপ পেল বাংলা-দেশের প্রতিষ্ঠায়। শুধু যে ঢাকা শহর ফেটে পড়ল এই আন্দোলনে তাই নয়, 'ভাষা-আন্দোলন' গ্রন্থ-মালার চতুর্থ খণ্ডের সংযোজনী খ-থেকে জানা যায় সারা পূর্ববাঙলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ বুঝতে পারে মনীষী মুহম্মদ শহী-দুল্লাহ-র সিদ্ধান্তের সারবত্তা, 'আমরা হিন্দু বা মুসল-মান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটা কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।' উচ্চশ্রেণীর বাঙালি মুসল-মানেরা একদা প্রচার করেছিলেন, সদ্বংশজাত মুসল-মানমাত্রেরই পূর্বপুরুষেরা এসেছেন আরব-ইরান-তুর্কি থেকে; তাঁদের ভাষা উর্দু। অন্যেরাও তাঁদের ভাবতেন আদর্শ। এইভাবে তাঁরা বাঙলায় বসবাস করেও

আর্থিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন প্রবাসী হয়ে। বদরুদ্দীন উমর দেখিয়েছেন, মুসলমানদের এই মানসিকতার পরিবর্তন শুরু হল পাকিস্তান পত্তনের পর থেকে এবং সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ভাষা-আন্দোলনে। তিনি চমৎকারভাবে বলেছেন, ১৯৪৭-এর পরেই যার সূত্রপাত, যে-ভাষা-সংস্কৃতির আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালে, তা আসলে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর মুসলমানের 'স্বদেশে প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম'।

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুত্বে আর শোষণে বিক্ষুব্ধ বাঙালি জনচেতনায় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উত্তাল হয়ে উঠছিল, বাঙলা ভাষাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজি না হওয়ায় তীব্র হল গণ-আন্দোলন। মিলে গেল ভাষার মর্যাদার দাবি আর স্বাধিকারের দাবি। দুই দাবি যে একই দাবির দুই পিঠ, তা পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ডিসেমবরে সোহরাবর্দির নেতৃত্বাধীন আওয়ামি মুসলিম লীগ একই সঙ্গে দাবি করে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক এবং পূর্ববঙ্গের মানুষকে দেওয়া হোক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। ১৯৫৩-র জুলাইয়ে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি একই কথা বলে। পরবর্তী রাজনৈতিক কার্যকলাপে স্বাধিকারের পাশাপাশি ভাষার মর্যাদা মুখ্য প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৪-র প্রাদেশিক নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের তাঁবেদার মুসলিম লীগকে ধূলিসাৎ করে যে-যুক্তফ্রনট বিপুলভাবে জয়ী হয়, তার একুশ-দফা কর্মসূচির মধ্যে অনেকগুলিই ছিল ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে। প্রথম, বাঙলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে; নবম, বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, এটা দশম কার্যসূচি। একাদশ, যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল কানুন প্রত্যাহার করে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়কে করতে হবে যথার্থ স্বয়ংশাসিত সংস্থা। ষোড়শ, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউজকে রূপান্তরিত করা হবে বাঙলাসাহিত্যগবেষণাকেন্দ্রে। সপ্তদশ, একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মরণে স্মৃতি-মিনার নির্মিত হবে এবং অষ্টাদশ, ঐদিন শহীদ-দিবস হিসাবে পালিত হবে এবং সরকারি ছুটির দিন হবে। এইসব আন্দোলন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলির প্রস্তাব অনুসারে উর্দু ও বাংলা উভয়েই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। ১৯৫৬ সালের গঠনতন্ত্রে এবং ১৯৬২ সালের আয়ুবি গঠনতন্ত্রেও বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

তিন

কিন্তু কোন্ বাঙলা? বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার শুরু যে তিরিশের দশকে, তখনই যে-ভাষাকে ঠাট্টা করে 'উর্দোস্কৃত' নাম দিয়েছিলেন গণিতবিদ্ মোহিত-মোহন ঘোষ 'উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভা' নামক (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯) কৌতুকরচনায় সেই ধরনের বাঙলাভাষাই অভিপ্রেত ছিল পাকিস্তান-পন্থীদের। লক্ষ্য ছিল বাঙলার গায়ে 'উর্দুর উর্দি পরাতে হবে।' ১৯৪৩ সাল থেকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল, বাঙলা সাহিত্যচর্চার সময় 'মনে রাখিবেন আপনারা মুসলমান।' বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র সাহিত্য চাই, সেই মুসলমানি বাঙলা গড়ে উঠবে পুঁথি-সাহিত্য, মিশ্রভাষা বা দোভাষী ভাষার আদর্শকে আশ্রয় করে। ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে বলা হয়েছে বাঙলা সাহিত্য হিন্দুর সাহিত্য, 'মুসলমানের সাহিত্য মুসলমানকেই রচনা করিতে হইবে।' 'বাঙলাদেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙলাভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে।' ইসলাম-সংস্পর্শরহিত বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের ভাষা পূর্ববঙ্গের শিক্ষার্থীরা যদি শেখে তবে সেটা হবে অত্যন্ত পরি-তাপের। এইসব কথা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ ও তাদের পূর্ববঙ্গীয় অনুচরদের কাজে গানের মতো

মধুর শুনিয়েছিল। একদিকে চলছিল বাঙলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেবার চেষ্টা, অন্যদিকে বাঙলা-ভাষাকে যথোচিতভাবে সংশোধনের উদ্যোগ। চেষ্টা হল বিধর্মী সংস্কৃতির যাবতীয় গন্ধ মুছে ফেলার, বাঙলা ভাষাকে তার হাজার বছরের ঐতিহ্য থেকে ছিন্ন করার। পাকিস্তান-পত্তনের গোড়ার দিকে বাঙলায় জোর করে আরবি-ফারসি শব্দ প্রচুর ঢুকিয়ে তাকে দেওয়া হল এক অচেনা বাঙলার চেহারা। তার নাম দেওয়া হচ্ছিল পাক-বাঙলা। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই কবি গোলাম মোস্তফা পরামর্শ দেন, নজরুল-কাব্যের একটা বিরাট অংশ যেহেতু পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেইহেতু নজরুল-রচনা-বলীর একটি সংশোধিত পাকিস্তানি সংস্করণ প্রকাশ করা উচিত। সেই ধরনের উদ্যোগেই 'নবজীবনের গাহিয়া গান / সজীব করিব মহাশ্মশান' হয়ে যায় 'নবজীবনের গাহিয়া গান / সজীব করিব গোরস্তান।' অথবা 'জয়গানে ভগবানে তুষি বর মাগো রে' পংক্তিতে ভগবানকে স্থানচ্যুত করে 'রহমান'। মন্দিরের শঙ্খ-ধ্বনি পরিণত হয় মসজিদের আজানে। রামধনুর বদলে লেখা হয় রংধনু। পরামর্শ দেওয়া হয় 'আমি তোমায় জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না' শুধরে লেখা হোক 'আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না', যেহেতু ইসলাম-ধর্মাবলম্বীরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে না।

সঙ্গে-সঙ্গে চলছিল জাতীয় সংহতির অজুহাতে বাঙলা ভাষা লেখার জন্য বাঙলার বদলে আরবি হরফ চালানোর উদ্যোগ। আরবি হরফ প্রচলনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। ১৯৫১ সালে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশ অগ্রাহ্য করে পূর্ববঙ্গ সরকার চতুর্থ শ্রেণী থেকে যেমন উর্দু-ভাষা শিক্ষা, তেমনি প্রথম শ্রেণী থেকে আরবি বর্ণ-মালা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। বাঙলা লেখার জন্য আরবি বর্ণমালা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল তাকে উর্দুর কাছাকাছি আনা, এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা। বদরুদ্দীন উমরের "ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ" বইতে প্রকাশিত জসিমুদ্দিনের চিঠি থেকে দেখি মন্ত্রী ফজলুর রহমান কবিকে পরিষ্কার জানান, উর্দু বর্ণমালা প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য তরুণেরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যকলায় আকৃষ্ট হয়ে নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। এই অপচেষ্টার উদ্দেশ্য যে বাঙলা ভাষাকে আক্রমণ করা তা পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। ড. শহীদুল্লাহ্ "আমাদের সমস্যা" পুস্তিকায় প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, জনশিক্ষার অছিলায় আরবি হরফে বাঙলা প্রচার বৃথা অর্থব্যয়। পাকিস্তান শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ডের ও বর্ণমালা বিবেচনার বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা স্মারকলিপি দিয়ে পরিষ্কার জানায়, 'আমরা মনে করিতেছি যে আরবি হরফ প্রণয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থানাধিকারী বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ও আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী বাঙলাভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করা হইতেছে।' এই আক্রমণ নতুন চেহারা নেয়, আয়ুবশাহীর সময়। প্রস্তাব হয়, উর্দু ও বাঙলার সাধারণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করার এবং রোমান বর্ণমালা ব্যবহারের। রোমান হরফ প্রবর্তন-প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করেন, যেমন ড. শহীদুল্লাহ্, তেমনি ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক আবদুল হাই প্রমুখ। তেরোটি বর্ণ বাদ দিয়ে বাঙলা বর্ণমালা সংস্কারের উদ্যোগ হয়, চেষ্টা হয় বাঙলা বানান ও ব্যাকরণের সরলীকরণের। যুক্তি সুবিধার, যুক্তি সরলীকরণের; কিন্তু নিহিত লক্ষ্য ছিল বাঙলা ভাষাকে পঙ্গু করার, পশ্চিমবঙ্গের বাঙলার সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন করার, বাঙলাকে পাক-বাঙলায় রূপান্তরিত করার।

বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে যাবতীয় পাকিস্তানি আক্রমণের প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা। প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকেরা

বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবীর যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার কথা সেই ভূমিকা তাঁরা অকুতোভয়ে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমান-বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে তাই চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল হাই, নীলিমা ইব্রাহিম, মুহম্মদ এনামুল হক, অজিত গুহ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের নাম। এই কারণেই মৌলনা রাশীদ আহ্সান ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বাঙালি ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, কমিউনিজম ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায়ের 'citadel and stronghold' এবং পাকিস্তান-বিরোধী ও ইসলাম-বিরোধী আন্দোলন-সমূহের '.fountainhead' বলে চিহ্নিত করেন। তাই ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী যে বুদ্ধিজীবী-শিক্ষক-ছাত্র হত্যায় লিপ্ত হয়েছিল সেই উন্মত্ততার পিছনে এক সুপরিকল্পিত লক্ষ্য ছিল। তারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিবাদী নেতৃত্বকে নিরমূল করতে চেয়েছিল। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, পদাবলীসাহিত্য, মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী", রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী অন্-ইসলামি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেবার চক্রান্ত শিক্ষক-ছাত্রদের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে যায়। তাঁরা মনে করতেন ওইসব সাহিত্য সমগ্র বাঙালিজাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। হিন্দু দেব-দেবীদের কথা আছে বলে কর্তৃপক্ষ বাঙলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বাদ দিতে চান, কিন্তু গ্রীক দেবদেবীর প্রসঙ্গ সম্বলিত ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোয় বাধা দেওয়ার কথা তাঁদের মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিকতা আকৃষ্ট করেছে বুদ্ধিজীবীদের এবং তরুণদের। অন্যদিকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের পূর্ববঙ্গীয় অনুচরদের মনে হয়েছে জাতীয় সংহতির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিঘ্নস্বরূপ, বাঙালির 'রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে।' তাই রবীন্দ্রনাথ আক্রান্ত হন। পাঠ্যতালিকা থেকে রবীন্দ্ররচনা বাদ দেবার চেষ্টা হয়, বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে সাহিত্যিক, শিক্ষক-ছাত্র, সাংবাদিকদের উদ্যোগে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালনের আয়োজন সরকার সুনজরে দেখে নি। অনুষ্ঠানে যোগদানে বিরত থাকতে গোপনে নির্দেশ দেওয়া হয় সরকারি কর্মচারীদের। বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করার অশুভ উদ্যোগের প্রতিবাদে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা, স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করা চলবে না, কারণ 'রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' তাঁরা মনে করেন। সচেতন বাঙালির প্রতিরোধে প্রতিহত হয় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আক্রমণ। বরং এইসব আক্রমণ তীব্রতর করেছিল তাঁদের রবীন্দ্রানুরাগকে। সৈয়দ আলী আহ্সান ঘোষণা করেছিলেন, 'জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি।' পূর্ববঙ্গের আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের ইতিহাসের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ হয়ে হুমায়ুন আজাদ চমৎকার জবাব দিয়েছেন, 'কিন্তু বাংলাদেশ ও সাহিত্য গেছে বিপরীত দিকে : রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালিত্বের জন্যে বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ও তাদের বঙ্গীয় অনুচরেরা নজরুলকে নিয়েও কম বিব্রত ছিল না। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধ, তার বিদ্রোহী মনোভাব নতুন রাষ্ট্রের কর্তাদের পছন্দ ছিল না। যেমন রবীন্দ্রনাথের তেমনি নজরুলের ভাবধারা পাকিস্তানের ইসলামি চরিত্রকে ভ্রষ্ট করবে—এই ছিল তাদের ভয়। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই দুই কবির জন্মোৎসব পালনকে মনে করা হয়, পাকিস্তান আদর্শের ভিত্তির উপর আক্রমণ। সুতরাং ছাত্রদের উপর নেমে এসেছিল দমন-পীড়ন। আবার কট্টরপন্থী-দের নজরুলকে দরকারও হয়, তরুণদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য। তিনি অন্তত মুসলমান, সুতরাং তাঁর একটা সংশোধিত

রূপকে ব্যবহার করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষ ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁর গানগুলিকে মাত্র ব্যবহার করত এক সময়ে। কোনো-কোনো শব্দও বদলে দেওয়া হত নির্দ্বিধায়। এমনকী যে-গান নজরুল আদৌ লেখেন নি, সেই গানকে নজরুলের গান বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নজরুলের রচনাবলীর পরিমার্জিত পাকিস্তানি সংস্করণ প্রকাশের মূঢ় প্রস্তাব যে হয়েছিল সে কথাও আগে উল্লেখ করেছি। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ইয়াহিয়া খান নজরুলের জন্মদিনে যে বাণী পাঠান তাতে স্বভাবতই মাত্র সেইসব কবিতার উল্লেখ থাকে যেগুলিতে ইসলামি সভ্যতা ও ইসলামের জাগরণের কথা আছে। তিনি নজরুলের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলেছিলেন, নজরুল উপমহাদেশের মুসলমানদের সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কবিকে এমন সংকীর্ণভাবে দেখানোর, তাঁকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখানোর, তাঁর রচনাকে সংশোধনের চেষ্টা বাঙালি বুদ্ধিজীবী মেনে নেয় নি। দাবি করেছে সমগ্র নজরুলকে চাই। পাশাপাশি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ প্রেস অ্যানড পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যানসের মাধ্যমে প্রতিবাদী বই ও পত্রিকা একের পর এক নিষিদ্ধ করে চলে। পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা এই বাক্‌স্বাধীনতাহরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বই বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে, সাহিত্য ও ললিতকলার অবাধ চলাচলের পথে বাধাসৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা হয়। লেখকদের স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে মুজিব, মৌলানা ভাসানির মতো রাজনৈতিক নেতা, জসিমুদ্দিন ও সুফিয়া কামালের মতো প্রবীণ কবি, ড. এনামুল হকের মতো বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যুক্ত হন। বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা ভাষার উপর নানা ধরনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পাকিস্তানের আক্রমণের এই আড়াই দশকের দীর্ঘ ইতিহাস পিছনে ছিল বলেই ১৯৭১ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, কোনো শক্তি সে যত প্রতাপশালী হোক না কেন, বাঙালির সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আর আঘাত হানতে সাহস করবে না।

আগেই বলেছি, বাঙলা ভাষা আন্দোলন ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সবচেয়ে জনপ্রিয় দিক। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, এই প্রতিবাদ-সঞ্জাত বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানের ইসলামি ভিত্তির উপর আঘাত। বলা হয়েছিল, এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ভারতের, তথা পশ্চিমবঙ্গের তথা বর্ণহিন্দুদের প্ররোচনা। এইসব ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য পাকিস্তানের সংহতি বিনাশ করে বৃহত্তর বঙ্গ প্রতিষ্ঠা। শাসকবর্গ বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদের প্রকাশকে যতই আক্রমণ করুক, যতই বিকৃত করে প্রচার করুক তার লক্ষ্যকে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব তাতে বিচলিত হয় নি। বাঙলায় ইসলামধর্ম বিজেতার তরবারি দ্বারা প্রচারিত হয় নি, ভক্তিবাদের প্রতি প্রবণ বাঙালির মধ্যে সেই ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল মূলত সন্ত-সুফী-দরবেশ-আউলিয়াদের দ্বারা। আর বাঙালি মুসলমানদের প্রায় সকলের পূর্বপুরুষ ধর্মান্তরিত হিন্দু বা বৌদ্ধ। ফলে ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান একই সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সুফল হিসাবে, বসরা-বোগদাদের দিকে না তাকিয়ে, মধ্যযুগ থেকে চলে আসা সেই সাধারণ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে, আত্মীকরণে, নবায়নে আগ্রহী হলেন পূর্ববঙ্গের মুসলমান বুদ্ধিজীবী। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথ নজরুল, জীবনানন্দ—সব তাঁদের কাছে গৃহীত হল মহান উত্তরাধিকার হিসাবে। ভজন কীর্তন যাত্রা বাউল ঝুমুর সহজিয়া গান ভাটিয়ালি সব পেল অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতির নানা রূপের মর্যাদা। নববর্ষ হয়ে উঠল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব; রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের জন্মজয়ন্তী যেমন পালিত হতে থাকল

মহাসমারোহে, তেমনি মধুসূদনের জন্মদিনে সাগরদাঁড়িতে সাড়ম্বরে মেলার প্রচলন হল। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দের দেশ-প্রীতিমূলক গান ও কবিতা ভাষা-আন্দোলনের সূত্রে স্থান পেল পুববাঙলার বাঙালির মুখে। এই আন্দোলনের ফলেই জেগে উঠল বাঙলা সাহিত্যের জন্য গভীর ক্ষুধা। ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ের গোড়ার দিকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ঢাকায় কোনো প্রকাশনা ছিল না বললেই চলে। ভাষা-আন্দোলনের প্রেরণায় সাহিত্যগ্রন্থ ও সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠল। পাকিস্তান-সরকারের বাধা সত্ত্বেও বেড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বইয়ের চাহিদা। বাধা এড়িয়ে নানা চোরাপথে সেইসব বই চলে এল পূর্ববঙ্গে। মধ্যবিত্তের আবির্ভাবে, শিক্ষার বিস্তারে, প্রধানত ভাষা-আন্দোলনে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল জয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে যেন এল এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তারই ফল হিসাবে পূর্ববঙ্গে সৃজনশীলতার এক আশ্চর্য ঢল নেমে এল। "বাঙালি সংস্কৃতির সংকট" প্রবন্ধে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, 'যতদিন না আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক হিসাবে গণ্য এবং স্বীকার করতে শিখবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টির গতিবেগ সঞ্চার করতে আমরা সমর্থ হবো না।' ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, একদিন যে-ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, সেই ঐতিহ্য স্বীকৃতি পেল, আর তখনই পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে সৃজনশীলতার গতিবেগ সঞ্চারিত হল। "ভাষা-আন্দোলন" পটভূমি গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ডে হুমায়ুন আজাদ ১৯৫২ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রবন্ধ-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, পূর্ববর্তী লেখকেরা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত বেশির ভাগ মেনে নিয়েছেন; সেই সময়ের প্রবন্ধের বিষয় ধর্মাশ্রয়ী, তার মধ্যে মেলে কম্যুনিজম-বিরোধিতা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলতা। কিন্তু ১৯৫২-পরবর্তী প্রবন্ধে ধীরে-ধীরে পাই আধুনিক চেতনার প্রকাশ। 'চিন্তা মুক্তি পায় পাকিস্তানবাদ থেকে—হয়ে ওঠে প্রগতিশীল ও আধুনিক।' যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি, জাতিগত আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিস্ফোরক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই দরুন পূর্ববাঙলায় প্রসারিত হল আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মনোভাব, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদ, ইহবাদ, মুক্ত-বুদ্ধি ও প্রশ্নশীলতা। সময়ের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন "শিখা" গোষ্ঠীর লেখকেরা; অনুকূল পরিবেশে তাঁদের ছড়ানো বীজ এতদিনে যেন ফলে-পুষ্পে বিকশিত হল।

চার

পূর্ববঙ্গের কবিদের জন্ম সেখানকার নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে, পূর্ববঙ্গের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে, ভাষার প্রশ্নে যে মধ্যবিত্তের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। কবিরা কেউ-কেউ ছিলেন রাজকর্মচারী, অনেকেই বেতার-সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত মানুষকে রাজনীতির সংশ্রবে আসতেই হয়। আমরা দেখেছি ভাষা-আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল নেতৃত্ব। কবিরা ছিলেন অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কান্বিত হয়ে উত্তাল দিনগুলিতে এই কবিদের পক্ষে ভাষাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংশ্রব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্য যে-কোনো বিষয় নিয়ে রাজনীতি সোচ্চার হয়ে উঠলে কবিরা তা এড়িয়ে যেতেও পারেন। কিন্তু রাজনীতির কেন্দ্র যেখানে ভাষা, সেখানে কবিরা নিস্পৃহ থাকবেন কীভাবে? ভাষাই

কবির উপাদান, ভাষাই কবির মাধ্যম, ভাষার মধ্যেই কবিতার আশ্রয়। ভাষাকে আক্রমণ তাই কবিতাকেই আক্রমণ। ভাষার জন্য যুদ্ধ, আসলে কবির পক্ষে, আত্মরক্ষার যুদ্ধ। ভাষা তথা কবিতা শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হলে, কবিকে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যূহে একজন সেনানী হতেই হয়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে, জাতিসত্তার প্রশ্নে, ভাষাকে কেন্দ্র করে যখন থেকে পূর্ববঙ্গের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে, তখন থেকেই সেই কারণে পূর্ববঙ্গের কবিতায় রাজনীতি একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল কবিতায় রাজনীতির ঐতিহ্য; সেই ঐতিহ্য চলে এসেছে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, মনুষ্যত্বহীনতা সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। পূর্ববঙ্গের গত চার দশকের কবিতা ভাষা-আন্দোলন-সঞ্জাত নবজাগরণের কাছে ঋণী তার প্রাণবন্ত আত্মপ্রকাশের জন্য। ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিচয়-সংকট থেকে মুক্তি, বাঙালিত্ব-সচেতনতা, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার, তার প্রেরণা ব্যতীত রচিত হতে পারত না এই কবিতাবলী। রাজনীতি বাঙালির কাছে এই সময় ছিল তার জাতিগত সংস্কৃতিগত আত্মরক্ষার উপায়; সেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কবিকেও রাজনীতিকে তার কবিতার বিষয় করে নিতে হয়েছিল। কবিতা অনেক সময় পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক অস্ত্রে; কবিকে হতে হয়েছিল শস্ত্রপাণি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই যদিও এক শ্রেণীর মুসলমান লেখক মুসলমানি বাঙলা সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তবু অখণ্ড বাঙলার চল্লিশের দশকের প্রগতিসাহিত্যের প্রভাব পূর্ববাঙলার পরবর্তী কালের অনেক লেখকের মধ্যে সক্রিয় ছিল। ফ্যাসিজমের প্রতিরোধের প্রয়োজনে মূলত কম্যুনিস্ট-দের সাংগঠনিক উদ্যোগে প্রগতি লেখক সংঘের ও প্রগতি সাহিত্যের পত্তন হয়। যুদ্ধাবস্থার, দুর্ভিক্ষের, সাম্প্রদায়িকতার মর্মান্তিকতাকে তুলে ধরা, তার প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তোলা হয়ে ওঠে প্রগতি-সাহিত্যের ব্রত। প্রগতিতে বিশ্বাসী সাহিত্যি-কেরা মনে করতেন রাজনীতি সাহিত্যের অনিবার্য অঙ্গ। দেশবিভাগের আগে থেকেই প্রগতি লেখক সংঘের শাখা ছিল ঢাকায় এবং তাকে কেন্দ্র করে একটি প্রগতিশীল সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। পরে দেশবিভাগের বিপর্যয়ে, তুমুল সাম্প্রদায়িকতার প্লাবনে, কমিউনিস্ট-দের বিরুদ্ধে সরকারি নির্যাতনে সংঘের তৎপরতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে ক্রিয়া-কলাপ স্তব্ধ হয়ে গেলেই তাত্ত্বিক বীজ নষ্ট হয়ে যায় না। এই প্রগতিবাদে বিশ্বাসীরাই ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ১৯৫২ সালে সংগঠিত হয় প্রধানত ফয়েজ আহমেদের উদ্যোগে। চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিক, কুমিল্লায় প্রগতি মজলিশ। রাজনীতিতে যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগের পাশাপাশি ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্যসম্মেলন। সাহিত্য রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয়, প্রগতি-সাহিত্যের এই মূল-নীতি এইসব উদ্যোগের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল এবং এই মূলনীতি পূর্ববঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতিতে, বাঙলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি আক্রমণের দিনে, বিশেষ কাজে লেগেছিল। সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রয়োজনে সাহিত্য-কবিতায় রাজনীতি প্রধান প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল অনিবার্যভাবে। এইভাবে চল্লিশের দশকের রাজনীতি-সচেতন কবিতার উত্তরাধিকার ন্যস্ত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের আক্রান্ত কবিদের হাতে। শঙ্খ ঘোষ, "যমুনাবতী" নিয়ে যাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব, তাঁর বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশের দশকের কবিরা যখন রাজনীতির প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন, কবিতায় শুদ্ধাচারকেই অভিপ্রেত বলে মনে করেছিলেন, সেই-সময় পূর্ববঙ্গের কবিরা বুঝেছিলেন রাজনীতি তাঁদের

নিয়তি। দুই দশকের বিচ্ছিন্নতার পর পশ্চিম বাঙলায় আবার রাজনীতি কবিতার একটি প্রধান প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে। কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের কবিতায় কখনো এই বিচ্ছেদ ঘটে নি। রাজ-নীতিকে কবিতায় না এনে উপায় ছিল না তাঁদের। তাই "বাঙলাদেশের নির্বাচিত কবিতা"-র ভূমিকায় মুহম্মদ নুরুল হুদা লিখেছেন, পূর্ববঙ্গের 'কবিতায় বর্ণিত হয়েছে প্রতিরোধের চিত্র, রচিত হয়েছে কিভাবে গৃহযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে পরিবর্তিত হয়েছে তারও মানস-আলেখ্য।...হাতের পাঁচটি আঙুল হয়ে উঠেছে পাঁচটি সঙ্গীন। হৃদয়কে বলা হয়েছে মারাত্মকতম সমরাস্ত্র।' এইসব কবিতার বেশ কিছু বড়ো বেশি উঁচু গলার, বিবৃতি-প্রধান এবং নিতান্ত ঘটনাশ্রয়ী। অনেক কবিতাই স্থায়ী ঝংকার রেখে যায় না। আবার, এটাও ঠিক, পশ্চিমবঙ্গের কবিদের তুলনায় পূর্ববঙ্গের কবিরা তাঁদের সামাজিক ভূমিকা বিষয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কবিতার এক অব্যবহিত সামাজিক-রাজ-নৈতিক ভূমিকা ছিল বলেই পূর্ববাঙলার কবিতা সরলতর, তার আবেদন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।

বর্তমান উৎপীড়ন ও প্রতিরোধের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান দেখেছেন বাঙলার মাটিতে নানা যুগের বহিরাগত আক্রমণকারীর আক্রমণকে—

ক্রুর পদাতিক যতো যুগে যুগে
উদ্ধত পায়ের দাগ রেখে গেছে কোমল পলির ত্বকে,
বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে
খুরে-খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনিয়া মাটি,
লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান যতো
অসুরগর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি;
বিদীর্ণ বুক নীলবর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাঙলাভূমি,
নত হয়ে গেছে মুখ ক্ষোভে ও লজ্জায়।
এবার মোছাবো সেই মুখ শোকাক্রান্ত,
তোমার আপন পতাকায়।
(তোমার আপন পতাকা)

এবার সংগ্রাম বাঙালির ভাষাকে নিয়ে, যে ভাষা কবি রক্ষা করেন নিজের চোখের মণির মতো। সেই ভাষা-সংগ্রামের ছবি উঠে আসে আল্ মাহমুদের কবিতায়—

তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টংকারে
তীরের ফলার মতো
নিক্ষিপ্ত ভাষার চীৎকার:
বাঙলা, বাঙলা— (নিদ্রিত মায়ের নামে)

লেখেন ফরহাদ মজহার,

আমি বিশদ যুদ্ধ জানি, খুব সহজে মরতে জানি
তোমার জন্যে লক্ষ লক্ষ বার এ আমি খুন হয়েছি।
কেউ কি এমন রক্ত ঢালে! রাখিস মা এই দাসেরে মনে
তোমার পদ্ম ফুটুক এবং আমার পরিপার্শ্বে রাখো
আশা আমার আশা আপা আম্মাময়ী প্রিয়তমা
তোমার পতিত জমি এবার আবাদ করবো
ফলবে সোনা। (মাতৃভাষা / মাতৃভূমি)

রক্ত দেব, মৃত্যু হবে, কিন্তু ছন্দের মধ্যে যেন এক বেপরোয়া মরিয়া ফূর্তির ভাব। ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানের ঘরে ফেরায় বাস্তবিক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটেছিল, সৃজনশীলতার পথ গিয়েছিল খুলে। হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, সানাউল হক, আল্ মাহমুদ, আবদুল গনি হাজারী, আহসান হবীবের আবির্ভাব হল সেই আন্দোলনের প্রেরণায়, পঞ্চাশের-ষাটের দশকে! সেই আন্দোলন যখন চূড়ান্ত রূপ নিল মুক্তিযুদ্ধে তখন উঠে এলেন আর-এক গুচ্ছ নতুন কবি—নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, মুহম্মদ নুরুল হুদা, মোহাম্মদ রফিক, মহাদেব সাহা প্রমুখ। এঁদের প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক কালে।

রাজনীতির কেন্দ্রে ছিল আক্রান্ত ভাষা, আক্রান্ত বর্ণমালা। এই গভীর বেদনায় শামসুর রাহমান লিখেছিলেন,

এখন তোমাকে নিয়ে খেওরার নোওরামি
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস!
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।
(বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী-বর্ণমালা)

আর-এক কবি জানিয়েছিলেন, যত দূরে, বিদেশে বা প্রবাসে যান না কেন তিনি, 'আদিম অক্ষররাশি / অ আ ক খ আমাকে রেখেছে ধরে'। ভাষার জন্য, জাতি-সত্তার জন্য মানুষের সংগ্রাম চলবেই—কবির কণ্ঠে এই অমোঘ ঘোষণা জানিয়েছিল পূর্ববঙ্গের বাঙালি—'বাঁচবার অধিকার কাড়তে / দাস্যের নির্মোক ছাড়তে / অগণিত মানুষের প্রাণপণযুদ্ধ / চলবেই চলবেই / আমাদের সংগ্রাম চলবেই।' স্বাধীনতার জন্যে বারবার নামতে হয়েছে রক্তগঙ্গায়, বারবার দেখতে হয়েছে খাণ্ডবদাহন। ভাষা-শহিদদের স্মৃতিতে প্রস্তুত মিনার ভেঙে দিলেও, শহিদ-মিনার ভাঙবে না, জানিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ—

যারা ধান বুনি
গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক, আমরা জনতা সেই অনন্ত।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু,
দেখ একবার আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার। (একুশে ফেব্রুয়ারি)

ভাষা-আন্দোলনে যার শুরু, বাঙলাদেশের স্বাধীনতায় তার প্রতিষ্ঠা। মুহম্মদ নুরুল হুদা তাই লিখেছিলেন, 'বাঙালির জন্মতিথি রক্তে লেখা ষোলো ডিসেম্বর'। সেই স্বাধীনতার রঙ-ও অচিরেই ফিকে হয়ে গেল। দেশে শিল্পায়ন নেই, দেশকে আর্থিক-ভাবে বিদেশী মূলধনের কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছে। একদিকে ১৯৭৫-উত্তর কালে শাসকশ্রেণীর নির্লজ্জ লুটতরাজ, অন্যদিকে সর্বহারা-নিঃস্বের দ্রুত সংখ্যা-বৃদ্ধি, এই হল বাঙলাদেশের বাস্তব চিত্র। আরবদেশ-সমূহের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে মৌলবাদ নতুন করে জোরালো হয়ে উঠেছে। পীড়িত কবিরা লক্ষ করলেন 'রাষ্ট্র / আর রাষ্ট্রযন্ত্র দিকে দিকে চলে গেছে নষ্টদের / অধিকারে'। বাঙালিকে একবার পাকিস্তানি করার চেষ্টা হয়েছিল, এখন তাকে বাঙলাদেশী করার চেষ্টা হচ্ছে। এই চেষ্টাও তার জাতিসত্তার বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন আক্রমণ। এই সবই ঘটেছে পনেরো বছর উর্দি-পরা বা উর্দি-ছাড়া সামরিক শাসনে। তাই রফিক আজাদ লিখেছেন,

শিশুহত্যা, নারীহত্যা, নেতৃহত্যা থেকে ক্রমাগত
নিহতের তালিকাটি দীর্ঘ হতে থাকে…
স্বদেশের রাজপথে ট্যাংক, রক্তচক্ষু ঘাতকের জীপ,
মধ্যরাতে অবিরাম সামরিক যানের আনাগোনা,
নগরে কারফিউ, সারা রাত ভাবি বুটের আওয়াজ—
ফাঁপা মানুষের মুখ টিভি-পর্দা জুড়ে, অযোগ্যের
দর্পে গ্রাম্যবধূর মতোন জড়োসড়ো মাতৃভূমি…।
(যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ)

দেশদ্রোহী, জনদ্রোহী, সাম্যদ্রোহী, শান্তিদ্রোহী বজ্জাত জালিম ধূর্ত ঠক দুঃশাসনদের অভিশাপ দিয়ে নির্মলেন্দু গুণ লেখেন—'তোর হাতে রক্ত, পায়ে কুষ্ঠ, কণ্ঠে নালী ঘা—আল্লার দোহাই লাগে, তুই নেমে যা, নেমে যা।'

সবশেষে দুজন কবির আত্মকথা উদ্ধৃত করছি। তা থেকেই বোঝা যাবে কেন রাজনীতি পূর্ববঙ্গের কবিতার অনিবার্য উপাদান। প্রবীণতর সানাউল হক, "নির্বাচিত কবিতা"-র ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি চল্লিশের দশকে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধকালীন মর্মান্তিক প্রেক্ষাপটে প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনে দীক্ষিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর দেখেছেন, 'পাকিস্তানি বাঙলায় মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার পাঁয়তারা ও প্রস্তুতি।' একদিন বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের অতর্কিত আক্রমণ ঘটল, তারপর এল বহু দুঃখের মধ্য দিয়ে বিজয়দিবস। কিন্তু মৃত্যু আর লাঞ্ছনার শেষ হল না। 'জোর যার মুল্লুক তার, দুর্নীতি আসর জমালো। অতিসাধের গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে রইল, সোনার বাঙলার সুমহান আশা-আকাঙ্ক্ষা আস্তা-কুঁড়ে নিক্ষিপ্ত।' এসবই কবিকে দেখতে হয়েছে, তার দিনপঞ্জি কবিকে লিখতে হয়েছে। নিজের "নির্বাচিত কবিতা"-র ভূমিকায় তরুণতর মহাদেব সাহা লিখেছেন, 'আমি দেখেছি এ দেশে মুখের ভাষার জন্যে মানুষ বুকের রক্ত দেয়। স্বৈরশাসনের পতনের জন্যে নিজের বুকে লিখে রাখে এ-যুগের অমর কাব্য; মানুষের এই মিলিত সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ও আমি প্রত্যক্ষ করেছি; এইসব কিছু মিলেই আমার কবিতা, এই সুখ-দুঃখ, অশ্রু-বেদনা, স্বপ্ন-ভালোবাসা, সাহস ও সংগ্রাম।' সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-ভালোবাসা, মানুষের মিলিত সংগ্রাম—এইসব কিছু মিলেই পুববাঙলার কবিতা। তাই আজ হেনা মোস্তফা কামাল যে-উপমা সব কবি সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন, সেই উপমা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কবি সম্পর্কে খাটে :

বাঘ মনেই অরণ্যের অজেয় অধিকার
তাজা টাটকা ডোরা
সমস্ত শরীরে উচ্চারিত শক্তি সাহস সৌন্দর্য
হয় বাঘ কিংবা বাঘ নয়,
শৌখিন বাঘ বলে কিছু নেই
কখনো থাকে না
তেমনি কবি…

১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভাগের পর পূর্বাংশের নাম কখনো হয়েছে পূর্ববঙ্গ, কখনো পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ। এই প্রবন্ধে ঐ ভূখণ্ড বোঝাতে পূর্ববঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যাদির জন্য প্রধানত ভারত সরকার প্রকাশিত Bangladesh Documents, G. P. Bhattacharjee-র *Renaissance and Freedom Movement in Bangladesh*, D. N. Banerjee-র *East Pakistan ; A Case Study in Muslim Politics*-এর কাছে ঋণী। ঋণী বদরুদ্দীন উমর, অমলেন্দু দে-র গ্রন্থাবলীর, সাঈদ-উর রহমানের "পূর্ব বাঙলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা" বইয়ের কাছে, বিশেষত পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত "ভাষা-আন্দোলন" পটভূমি গ্রন্থমালার কাছে।

নিজ নিকেতন

সমীরকুমার রায়

চন্দ্রপ্রভা টের পেলেন, চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা জল শুকনো গালের উপর নেমে এল। আঙুল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে নিলেন। রুম-মেটটি খাটে বসে বই পড়ছেন। নজরে পড়ে গেলে লজ্জার একশেষ হত। কারো সামনে চোখের জল ফেলা চন্দ্রপ্রভা পছন্দ করেন না। নিজের দুর্বলতা তাতে প্রকাশ পায়। অন্যে মজা মারে।

সকালে এসেছেন। সুবিমল সঙ্গে ছিল। রেজিস্টার সই করার পর এই ঘরটা আর এই বেড তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। সুবিমল এখন আর নেই। চন্দ্রপ্রভা আছেন।

ঘরটা কতদিন চুনকাম করা হয় নি? দেওয়ালে নোনা ধরে গেছে। জায়গায় জায়গায় ঝুল। সিলিঙের কয়েক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। যদি একদিন একটা মাথায় পড়ে? যা হবার তা হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কেউ পারে? তিনি কি পেরেছেন? চোখ বোজেন। 'এখন ভগবান নিলেই বাঁচি'—চন্দ্রপ্রভা মনে-মনে বলেন।

'আপনার নাম কী ভাই?'

রুম-মেট বই থেকে চোখ তুললেন, তাঁর দৃষ্টি পাশের খাটের দিকে ঘুরে গেল, ভালো করে চন্দ্রপ্রভার মুখ দেখলেন, 'চিরন্তনী'!

কী অদ্ভুত নাম, চন্দ্রপ্রভা ভাবেন। এইবার ছোটো করে ছাঁটা চুল ওই ভদ্রমহিলা তাঁর নাম জিজ্ঞেস করবেন, এরকম প্রত্যাশা করেন। চিরন্তনী ফের বইয়ের পাতায় মনোযোগ দেন। অমিশুক এবং অভদ্র, চিরন্তনী সম্পর্কে চন্দ্রপ্রভা এই দুই বিশেষণ মনে-মনে ব্যবহার করেন। তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল। তিনি এখানে আজ প্রথম এলেন। চিরন্তনী আগে থেকেই আছেন। চিরন্তনীরই উচিত ছিল, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর পরিচয় নেওয়া। কিন্তু মমির মতন চুপ করে ছিলেন। পুরো ঘরটা একা-একা বেশ ভোগ করা যাচ্ছিল, এখন চন্দ্রপ্রভা এসে বাদ সাধলেন। সইবে কেন, জ্বালা তো ধরবেই। চন্দ্রপ্রভার মনে এইসব ধারণা আর অনুমানের উদয় হল।

চন্দ্রপ্রভা খাট থেকে নামলেন। বারান্দায় এলেন। সামনে বেশ কিছুটা খোলা মাঠ। ছোটো-ছোটো ছেলেরা বল নিয়ে খেলছে। স্কুলে যাবে না? আজ তো রোববার, ছুটি! চন্দ্রপ্রভার মনে পড়ল। সুবিমলও এরকম ছোটো ছিল, হাফ-প্যানট পরে ফুটবল খেলত। চন্দ্রপ্রভা সেই বাচ্চা সুবিমলকে যেন দেখতে পেলেন। 'মা, খেতে দাও, খিদে পেয়েছে।' জীবনে কিছু-কিছু স্মৃতি চিরকাল জীবন্ত থাকে।

লম্বা বারান্দা। দোতলার সারদেওয়া ঘরগুলোর সামনে। কয়েকজন বৃদ্ধা চেয়ারে বসে আছেন। চন্দ্রপ্রভা অনেকক্ষণ মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সুবিমলই ছানি অপারেশান করিয়ে দিয়েছে।

আসার সময় সুমনা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। চন্দ্রপ্রভা সেই প্রণামের স্বীকৃতি দেন নি। সুমনার মাথায় তাঁর কাছ থেকে কোনো আশীর্বাদ নেমে আসে নি। 'জুতো মেরে গোরু দান'—তিনি মনে-মনে বলেছিলেন। 'ডাইনি'—এও তিনি মনে-মনে বলেছিলেন। সুমনা কেন সে সময় তাঁকে প্রণাম করেছিল? সুবিমলকে দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। কত রঙ্গই যে জানে। না জানলে কি আর সুবিমলকে ভেড়া বানিয়ে রাখতে পারত? চৌষট্টি কলা নয়, শত কলা জানে। জানবেই তো। ডাইনি যে। ছলাকলা-বিদ্যায় পারদর্শিনী।

'আজ এলেন?'

চন্দ্রপ্রভা ডান দিকে তাকালেন। বৃদ্ধার পরনে চওড়া-পাড় শাড়ি আর রঙিন ব্লাউজ। সিঁথিতে সিঁদুর। ইনি তবে কেন এখানে?

'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধা চন্দ্রপ্রভা কবে এসেছেন তা জানার জন্য এই প্রশ্ন করেছেন, তাঁর প্রশ্ন করার ধরনে তা মনে হয় না, আলাপ বা পরিচয় করার সূত্রপাতের ধরনেই তাঁর এই জিজ্ঞাসা তা বোঝা যায়। চন্দ্রপ্রভা যে বোঝেন না সেরকম নয়। তবু উত্তর দেন। যেহেতু তা দেওয়া উচিত।

'আপনার পাশের ঘরে আমি থাকি।' বৃদ্ধা জানান। চন্দ্রপ্রভা এবার কী বলবেন? এই সময় অন্যদিন নিজের ঘরে বসে থাকেন। নিজের ঘর? তিনটে বেড-রুম, লম্বা ড্রইং-কাম-ডাইনিং, দুটো টয়লেট, কিচেন একটা, দক্ষিণ দিকে একটা বারান্দা। সুবিমল প্রোমোটারের কাছ থেকে কিনেছে। উত্তরের ঘরটায় চন্দ্রপ্রভা থাকতেন। নিজের ঘর? এর আগে পর্যন্ত ভাড়া-বাড়িতে থেকেছেন। শিবনারায়ণের রোজগার বেশি ছিল না। নিজের বাড়ি করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। সেই সংসারে চন্দ্রপ্রভাই কর্ত্রী ছিলেন। ভাড়া-বাড়িতেই শিবনারায়ণের মৃত্যু হয়। সে সময় সুবিমল সবে বিয়ে করেছে। লাভ-ম্যারেজ। নিজেরাই ঠিক করে। সুবিমলের বন্ধুর বোন সুমনা। একজন মানুষের মৃত্যু আর-একজনের জীবনে কী গভীর আলোড়ন তোলে! সবকিছু তছনছ করে দেয়। শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর চন্দ্রপ্রভা অনুভব করলেন—তাঁর পেছনে কোনো খুঁটি নেই। সংসারে তাঁর কর্তৃত্ব বলে কোনো কিছুই আর রইল না। তিনি অবাঞ্ছিত হয়ে পড়লেন।

'আপনার নাম কী, ভাই?'

'চন্দ্রপ্রভা।'

'আসুন না আমার ঘরে, বসে গল্প করি।'

পুরো একটা ঘর, অ্যাটাচড্ টয়লেট, দুটো চেয়ার। এই ঘর চন্দ্রপ্রভার মধ্যে এখন কোনো ঈর্ষা জাগায় না। তিনি এখনো কিছু বুঝতে পারছেন না। এই বাড়িতে তাঁকে থাকতে হবে? তাঁর সংসার? ছেলে, নাতি, পুত্রবধূকে নিয়ে যে সংসার, বেহালার সেই ফ্ল্যাটে, সেখানে তাঁর আর কোনো জায়গা নেই, সবকিছু তাঁর দুর্বোধ্য ঠেকে, তিনি কিছু বুঝতে পারে না।

'আমার নাম শেফালিকা'। কথাটা বলে বৃদ্ধা শব্দ করে হেসে ওঠেন, 'এটা অবশ্য আমার পিতৃদত্ত নাম নয়। এফিডেভিট করে আসল নাম পালটে

আমি এই নাম নিয়েছি।'

আসল নাম, নকল নাম, এফিডেভিট—চন্দ্রপ্রভা বুঝতে পারেন না। শেফালিকাকে তাঁর সহজ, স্বাভাবিক ভালো মনে হয় না। বিধবা নন, অথচ এখানে। তার মানে, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

সুন্দর করে সাজানো ঘর। র‍্যাকে অনেকগুলো বই পরপর গুছিয়ে রাখা। টেবিলে খাতা আর কলম, তার পাশে ফুলদানিতে একগোছা ফুল। যেন নিজের বাড়ি, নিজের ঘর। কোথাও ঠাকুর-দেবতার ছবি বা মূর্তি নেই। 'নাস্তিক, ঠাকুর-দেবতায় শ্রদ্ধা নেই', চন্দ্রপ্রভা মনে-মনে বলেন। তিনি সঙ্গে করে তাঁর নারায়ণ, কালী আর শিবের বাঁধানো ফটো নিয়ে এসেছেন। বাড়িতে এই তিন ঠাকুরকে রোজ ভোরে পুজো করেন। আজও করেছেন। এখানকার ঘরে এখনও সাজিয়ে রাখেন নি। বিকেলের দিকে রাখবেন। এখানে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না, সারাক্ষণ অস্বস্তি তাঁকে ঘিরে রেখেছে। এ কোন্ জায়গায় সুবিমল তাঁকে আনল।

'আমি বেশ আছি। স্বামীর সঙ্গে আমার অনেক দিন কোনো যোগ নেই। তাঁর ঘর ছেড়ে মেয়েদের হোস্টেলে গিয়ে উঠেছিলাম। কত বছর হয়ে গেল। বুড়ো হয়ে যাবার পর এখানে এসেছি।'

'কেন?'

শেফালিকা কোনো শব্দ না করে হাসলেন। কিছুক্ষণ সিলিঙের দিকে চেয়ে রইলেন।

'আমি একটা ছেলেকে ভালোবাসতাম। তা সে খুন হয়ে যায়। তারপর বাবা আমার বিয়ে দেন। বিয়ের দু-বছর বাদেই জানতে পারি, আমার দাদাই তাকে খুন করিয়েছিলেন। তাকে আমার বাড়িতে কেউ পছন্দ করত না। আমাদের ব্যবসায়ী পরিবার। সে কাজকম্ম কিছু করত না। খালি কবিতা লিখত। আমার সঙ্গে না মেশার জন্য বাবা আর দাদা তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন। সে শোনে নি।'

চন্দ্রপ্রভা বুঝলেন, তাঁর ধারণাই সঠিক, এই বুড়িটা বদ, দুশ্চরিত্রা।

অতীতচারণ একটা আবেগ। শেফালিকা মাঝে-মাঝেই এর দ্বারা তাড়িত হন। এখন যেমন।

'যখন জানলাম আমার জন্যই তাকে জীবন হারাতে হল, তখনই ঠিক করি, আমি আর সংসার করব না। স্বামীকে সব কথা চিঠিতে লিখে জানিয়ে তাঁর ঘর ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে আসি। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত বলতে পারেন। দাদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।'

চন্দ্রপ্রভা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গোটা শরীর ঘিনঘিন করছে। এ কোথায় সুবিমল তাঁকে রেখে গেল। যত সব খারাপ মেয়েমানুষের ভিড়। তিনি এখানে থাকবেন না। সুবিমল এলেই তার সঙ্গে চলে যাবেন। আর এক মুহূর্ত থাকবেন না। কী জঘন্য জায়গা এটা। সৎ মানুষ কেমন করে এখানে থাকতে পারে। অসম্ভব।

হলঘরের মাঝখানে বড়ো ডাইনিং টেবিল। চন্দ্রপ্রভা এসে দেখলেন, তিনজন বৃদ্ধা সেখানে খাচ্ছেন। এঁটোর বাছবিচার নেই। চমকিত আঘাত বোধ করলেন। এইখানে এঁদের সঙ্গে তাঁকে খেতে হবে?

'কী হল, বসুন।' শেফালিকা বলেন। তিনিই চন্দ্রপ্রভাকে খাওয়ার জন্য ঘর থেকে ডেকে এনেছেন। নতুন এসেছেন, সবকিছু চিনিয়ে, জানিয়ে দেওয়া দরকার।

নিজের থালা, গ্লাস নিয়ে চন্দ্রপ্রভা ঘরের এক কোণের দিকে এগোলেন।

'এ কী করছেন?' শেফালিকা বলেন, 'ওদিকে কেন যাচ্ছেন? টেবিলে এসে খান।'

চন্দ্রপ্রভা মুখ বিকৃত করেন, 'যতসব! এঁটো-কাটার বাছবিচার নেই।'

তিনি থালা-গ্লাস দিয়ে মেঝেতে বসলেন। শেফালিকা বিষণ্ণভাবে হাসেন।

'নিরামিষ আলাদা করে করা হয় তো?' যে বউটি ভাত দিচ্ছিল, চন্দ্রপ্রভা তাকে জিজ্ঞেস করেন।

বউটি কোনো উত্তর দেয় না। পাতে ভাত ঢেলে দিয়ে চলে যায়।

চন্দ্রপ্রভা নিজেকে অপমানিতা বোধ করেন। বউটির দিকে তিনি কটমট করে তাকালেন।

ডাইনিং-রুম একতলায়। খাওয়ার পর দোতলায় ওঠার উদ্দেশ্যে সিঁড়ির কাছে গিয়ে তিনি ঝগড়ার চিৎকার শুনতে পেলেন। সিঁড়িতে না উঠে সেই শব্দ অনুসরণ করে সামনের দিকে এগোলেন। এখানেও সারসার কয়েকটা ঘর। সামনের বারান্দায় দুই বৃদ্ধা চিৎকার করে ঝগড়া করছেন। কয়েকজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন আর শুনছেন। চন্দ্রপ্রভা কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'তুই আমার টাকা চুরি করেছিস।' একজন বলেন। 'তোর টাকা চুরি করতে আমার বয়ে গেছে। আমার ছেলেরা যা টাকা পাঠায় তাই-ই আমি খরচ করে উঠতে পারি নে। আমি যাব তোর টাকা নিতে?'

'হুঁঃ!' প্রথম বৃদ্ধা মুখ-চোখ বিকৃত করেন, 'তোর ছেলেরা কত টাকা পাঠায় তা আমার জানা আছে।'

'তবে রে……' দ্বিতীয় বৃদ্ধা এর পর একটা গালাগালি উচ্চারণ করেন, প্রথম বৃদ্ধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বৃদ্ধা প্রথমার মুখে আর গলায় আঙুল দিয়ে খিমচে দেন। প্রথম বৃদ্ধা দ্বিতীয়ার চুল খিমচে ধরেন। বৃদ্ধানিবাসের দুজন কর্মচারী এই সময় চেঁচামেচি শুনে এখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা দুই বৃদ্ধাকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু তাঁদের চিৎকার, গালাগালি, কটূক্তি বন্ধ হয় না।

চন্দ্রপ্রভা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেন। তিনি মনে-মনে বলেন, 'মরবার সময় হল', এরপর তিনি নারী-শব্দের একটি ইতর প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন, তারপর যোগ করেন, 'তবু ঝগড়া-মারামারি করছে দেখো।'

চিরন্তনীর খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি তক্তপোশে চোখ বুজে শুয়ে। চন্দ্রপ্রভা তাকিয়ে দেখেন। বুড়ি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েন নি। এই তো সবে দুপুরের খাওয়ার পাট চুকছে। তাহলে নিশ্চয়ই চন্দ্রপ্রভার পায়ের শব্দ কানে গেছে। তবু চোখ খুললেন না। 'দেমাক দেখো', চন্দ্রপ্রভা মনে-মনে বলেন। নিজের তক্তপোশে এসে বসেন।

রন্তু এখন কী করছে? মাসির বাড়ি থেকে কি ফিরেছে? তাঁকে নিয়ে আজ সকালে সুবিমল যখন বেরোয়, রন্তু ছিল না। কাল সে মাসির বাড়ি গেছে। গেছে, না পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে? সুমনাই পাঠিয়ে দিয়েছে? সে সকালে বাড়িতে থাকলে, চন্দ্রপ্রভাকে নিশ্চয়ই কিছুতেই যেতে দিত না। এই ভয়েই কি সুমনা তাকে কাল মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে? নিশ্চয়ই তাই। 'তুই আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করলি, ছেলের বউয়ের কাছেও ঠিক সেই ব্যবহারই পাবি।' মনে-মনে সুমনাকে শাপ দেন। আগেও অনেকবার দিয়েছেন, কখনো মনে-মনে, কখনো-বা উচ্চারণ করে। এখন তো মুখে বলার কোনো ব্যাপার নেই, যেহেতু সুমনা এখন সামনে বা কাছে নেই। সেই কারণে মনে-মনেই বলেন। যদি রন্তু ফিরে এসে থাকে, তাহলে তাঁকে না দেখে তার কী প্রতি-ক্রিয়া হয়েছে? প্রায় রোজ সন্ধেবেলা তাঁর কাছে বসে সে গল্প শুনতে চাইত। সেই সময় সুমনা ডাক দিত, 'রন্তু, পড়তে এসো।' ছেলে ঠাকুমাকে ভালো-বাসুক, ঠাকুমার কাছে থাকুক, সুমনা চাইত না। কিন্তু রক্তের টান যাবে কোথায়! রন্তু সেই ঘুরেফিরে বারবার চন্দ্রপ্রভার কাছে এসে বসত। চন্দ্রপ্রভা হাসেন।

কোনোদিন ভাবেন নি, বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে বাস করতে হবে। কোনোদিন, কখনো নয়। চোখ বেয়ে আবার জল গড়িয়ে এল। হাত দিয়ে মুছে দিলেন। চিরন্তনী এখনো চোখ বুজে শুয়ে আছেন।

মাথার দিকের খোলা জানালা দিয়ে কিছুটা আকাশ চোখে পড়ে। শিবনারায়ণ কি ওই আকাশেরই কোথাও বাস করছেন? তিনি কি এখন চন্দ্রপ্রভাকে এই তক্তপোশের উপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন?

তিনি কি কোনোদিন চন্দ্রপ্রভার এই হাল কল্পনা করতে পেরেছিলেন? তাঁর উপর চন্দ্রপ্রভার অভিমান জেগে ওঠে। তিনি চলে গিয়েই তো চন্দ্রপ্রভাকে এই দুর্দশার মধ্যে ফেলে গেছেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, সুমনার কি সাধ্য হত চন্দ্রপ্রভাকে এই হেনস্থার মধ্যে ফেলতে? তিনি ছিলেন চন্দ্রপ্রভার খুঁটি, তিনিই থাকতেন চন্দ্রপ্রভার খুঁটি। চন্দ্রপ্রভার আজকের সব অপমানের জন্য তাই তিনিই দায়ী।

বিকেলে চন্দ্রপ্রভা ছটফট করতে শুরু করলেন। রন্তু নিশ্চয়ই তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে একটু বাদেই এখানে চলে আসবে! তাঁকে এখানে থাকতে দেবে না। বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি কী-কী কথা বলবেন, মনে-মনে তার মুসাবিদা করতে থাকেন। চট করে রাজি হয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাতে সুমনার কাছে তাঁর মর্যাদা কমে যাবে। তাই প্রথম-প্রথম ফিরে যেতে আপত্তি জানাবেন। রন্তু কি তা আর শুনবে? জোর করে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইবে। তখন তিনি এমন একটা ভাব দেখাবেন যেন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কেবলমাত্র রন্তুর জোরাজুরির জন্যই বাড়ি ফিরে যেতে সম্মত হয়েছেন। সুমনার কানে সব কথাই যাবে, সুবিমলই গিয়ে বলবে, তখন তাঁর মাথা কত উঁচুতে উঠে যাবে। এ ছাড়া অভিমানের একটুকরো কাঁটাও খচখচ করে বইকি! একসঙ্গে এতগুলো বছর বাস করলেন, শেষকালে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া, এটা উচিত কাজ হয়েছে? তিনি না শাশুড়ি, মা? সেটা মনে পড়ল না? এভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হল? স্বামী নেই বলে? কোনো খুঁটির জোর নেই, তাই?

'চলুন! পার্কে একটু বেড়িয়ে আসি।' শেফালিকা বলেন।

তিনি আর চিরন্তনী বেরোচ্ছেন।

'না, আপনারা যান। আমি এখন আর বেরোব না।' চন্দ্রপ্রভা বেরোলেন না। রন্তু নিশ্চয়ই আসবে। আজ যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। সুবিমলকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুমাকে এখানে রেখে যাওয়া সহ্য করবে না। চেঁচিয়ে, ঝগড়া করে বাড়ির সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। পরের বাড়ির মেয়ে বুঝতে পারবে, রক্তের টান কাকে বলে। এখন তিনি কী করে বাইরে যাবেন! এখন যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বেরোলেন না। থেকে গেলেন।

সময় কখনো যায় আস্তে, কখনো তাড়াতাড়ি। একই সময় একই সঙ্গে দুজন মানুষের কাছে দুভাবে কেটে যাচ্ছে, মনে হতে পারে, তাদের দুরকম ধারণা হতে পারে। কারও মনে হতে পারে, বড্ড তাড়াতাড়ি সময় চলে যাচ্ছে, কেউ ভাবতে পারে—খুব আস্তে সময় পার হচ্ছে। অথচ সময় এক ও অভিন্ন।

চন্দ্রপ্রভা তক্তপোশের উপর পাতা বিছানায় দু-পা জড়ো করে বসে আছেন। পুজো করার সময় তিনি এই ভঙ্গিতেই বসেন। এখন অবশ্য পুজো করছেন না, এখন তাঁর পুজোর সময়ও নয়। তিনি এখন প্রতীক্ষায় বসে। শেফালিকা আর চিরন্তনী অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন। এখনো ফেরেন নি। চন্দ্রপ্রভার মনে হতে লাগল, বিকেলটা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। একটু দূরে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখের রাগত ভাব স্পষ্ট। চন্দ্রপ্রভা শুনতে পেলেন, সেই বৃদ্ধা কাউকে উদ্দেশ করে গালাগালি দিচ্ছেন। কান খাড়া করে বুঝতে পারলেন, ছেলে আর ছেলে-বউদের উদ্দেশ করে। কেন পেটে ধরলেন, কেন জন্মমাত্র নুন দিয়ে মেরে ফেললেন না; কেন যে ভুল করে এইসব শাঁক-চুন্নিদের ঘরে আনলেন, এইসব আপশোসও রয়েছে। চন্দ্রপ্রভা কিছুক্ষণ শুনলেন। সমর্মিতা বোধ করলেন। একসময় পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বৃদ্ধা মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। বৃদ্ধার মুখের লোল-চর্ম বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। ভদ্রমহিলার চেহারা বড্ড রুগ্ন। তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন। তলার পাটির সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে। বাঁধানো হয় নি।

'অদ্দেষ্টের কথা বলছি, ভাই। অদ্দেষ্টের। কোনো দিন কি ভেবেছিলাম, যাদের পেটে ধরেছিলাম তারাই বউ পেয়ে আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। একবারও ভাবল না, মা না থাকলে তোরা যে কবে মারা যেতিস, তখন কোথায় থাকত তোদের এইসব বউ আর বড়ো-বড়ো কথা!'

'কী আর করবেন ভাই, সবই ভাগ্য।' চন্দ্রপ্রভা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

সেই বৃদ্ধা চুপ করে থাকেন। কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে আরো জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। সান্ত্বনা তাঁর আবেগকে মথিত করে।

'আপনি কি নতুন এলেন?' সেই বৃদ্ধা খানিক পরে জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ, আজ এসেছি', চন্দ্রপ্রভা উত্তর দেন। তারপর যোগ করেন, 'তবে আমাকে নিয়ে যাবে। আমার নাতি তো তার মাসির বাড়িতে আছে। সে ফিরলেই আমাকে এসে নিয়ে যাবে। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না তো। আজ যদি ফেরে আজই নিয়ে যাবে। তাই তো অপেক্ষা করছি।'

আকাশে চাঁদ ওঠে; একটা, দুটো করে আস্তে-আস্তে অনেকগুলো তারা দেখা যায়। রাস্তার ধারের ল্যাম্প-পোস্টে-পোস্টে আলো জ্বলে। চন্দ্রপ্রভা দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই বৃদ্ধা এক সময় ঘরে চলে যান।

রাতের খাবারের ঘণ্টা বাজে। তাহলে, রন্তু আজ আর মাসির বাড়ি থেকে ফেরে নি। কবে ফিরবে? তবে কি সুমনা বেশ কিছুদিনের জন্যই তাকে মাসির বাড়িতে পাচার করে দিয়েছে? পাছে ফিরে এসে ঠাকুমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য চেঁচামেচি, জেদাজেদি করে? 'ডাইনি একটা', চন্দ্রপ্রভা মনে-মনে বলেন। 'আমিও তো একদিন বউ ছিলাম, শাশুড়ি নিয়ে ঘর করেছি, কই কখনও তো এমন অচ্ছেদ্দা করি নি। যতদিন শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন তিনিই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, তাঁর হুকুম সবসময় মান্য করেছি।' চন্দ্রপ্রভা কেঁদে ফেলেন।

এখন ঘন অন্ধকার। দরজায় ভেতর থেকে খিল লাগানো। চন্দ্রপ্রভার চট করে ঘুম আসতে চায় না। বয়স তো হয়েছে। এখন সবদিক থেকেই রোগ আক্রমণ করেছে। অনিদ্রারোগও। তা ছাড়া এই নতুন জায়গায় আজই তো প্রথম রাত কাটানো। সেটাও ঘুম সহজে আমার পক্ষে প্রতিবন্ধক। চিরন্তনী ঘুমিয়ে পড়েছেন। চন্দ্রপ্রভা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখার চেষ্টা করলেন। সেই পর্যন্তই। দেখতে পেলেন না। দেখার কথাও নয়। এই বয়সে দৃষ্টিশক্তি অনেক দুর্বল। তাঁর পক্ষে অন্ধকার ভেদ করা বা অন্ধকারে ধাতস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবু কেন যে চেষ্টা করলেন, কে জানে।

ভোরে চোখ মেলার পর বিস্ময় বোধ করলেন। এটা তো তাঁর ঘর নয়। এখানে কী করে এলেন? আর রন্তুই বা কোথায়? ভোরে উঠে চোখ মেলে প্রথম তিনি রন্তুকে দেখতে পান, নিজের ঘর থেকে চলে এসে তাঁর পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। তাকে এখন তিনি দেখতে পান না। সে কোথায় গেল? এতক্ষণ তো তার চলে আসার কথা।

চন্দ্রপ্রভার মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ধীরে-ধীরে সচল হল। ও! এটা তো তাঁর বাড়ি নয়। কাল তিনি এখানে এসেছেন। সুবিমল রেখে গেছে। রন্তুকে এখানে কোথায় পাবেন তিনি। তাকে তো এখানে পাওয়ার কথা নয়। এই ঘরে আর-একটা তক্তপোশে সেই বুড়িটা শুয়ে আছেন, যাঁর নাম চিরন্তনী। চন্দ্রপ্রভা চুপ করে শুয়ে থাকলেন। এখানে তাঁর একটা দিন থাকা হল। কাল সুবিমলকে নিয়ে রন্তু আসে নি, তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া হয় নি। রন্তু কবে মাসির বাড়ি থেকে ফিরবে? কবে তাকে বাড়িতে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে? ছেলের বউয়ের সঙ্গে তিনি আর ঝগড়া করবেন না। তাঁর খুঁটির জোর কোথায়? জোর তো দূরের কথা, খুঁটিই কোথায়? নিজের পেটের ছেলে! এমন কোনো দিন কল্পনা করতে পারেন নি।

সকালে পুজো করতে বসলেন। মনের মধ্যে একটা ঘিনঘিনে ভাব ছড়িয়ে রইল। এখানে এঁটোকাঁটা, আচার-বিচার মানামানি নেই, সবকিছু অস্বস্তিকর। তবু এই পরিবেশেই পুজো করতে হবে। কতদিনের অভ্যেস। সেই ছোটোবেলায় এ-সংসারে বিয়ে হয়ে আসার পর শাশুড়ি সঙ্গে নিয়ে সকালে পুজোয় বসাতেন, নিজেও পুজো করতেন, তাঁকেও পুজো করতে বলতেন। সেই থেকে অভ্যেস। চন্দ্রপ্রভা আজ পুজোয় বসার আগে এইসব ভাবলেন আর মনে করলেন।

তাঁর পুজোর মধ্যেই চিরন্তনী উঠে পড়েছেন। চন্দ্রপ্রভা অনেকক্ষণ ধরে পুজো করেন। অভ্যেস। চিরন্তনী তাকিয়ে-তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন। তার-পর বেরিয়ে গেলেন। চোখ-মুখ ধুতে হবে।

সেই বৃদ্ধা, কাল যিনি বারান্দায় ছেলেদের আর পুত্রবধূদের গালাগালি আর শাপ-শাপান্ত করছিলেন, তাঁর সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার খাওয়ার ঘরে দেখা হল। শেফালিকা বা চিরন্তনীর সঙ্গ চন্দ্রপ্রভার পছন্দ হয় না, অস্বস্তি বোধ করেন, কেমন যেন। এই বৃদ্ধার কাছে তিনি সহজ হতে পারেন, স্বাভাবিক বোধ করেন, মন খুলে দুটো কথা বলতে পারেন।

'জ্বর হয়েছে!' সেই বৃদ্ধা বলেন। তাঁর দৃষ্টিতে অসহায়তা-বোধ ফুটে উঠেছে। ফ্যালফ্যাল চাউনি। নিরাপত্তাবোধহীনতা তাঁর ভেতরটা যেন কুরে-কুরে খাচ্ছে।

'এখানে ডাক্তার পাওয়া যায় না?' চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞেস করলেন।

'বড়ো অসুখ করলে আসে। ছোটোখাটো অসুখে অফিস থেকেই ওষুধ দিয়ে দেয়।'

'খবর দিয়েছেন?'

'অফিসে বলেছি। দেখি কী করে।' বৃদ্ধা বলেন। একটু থেকে যোগ করেন, 'আর পারি না। কতদিন যে বেঁচে থাকতে হবে! যমও তাকায় না।'

'আপনি এখানে কতদিন আছেন?'

'বছর দুয়েক হল।'

'আপনার ছেলেরা কী করে?'

'তিনজনেই চাকরি করে।'

'তা কেউই রাখতে চাইল না?'

'প্রথম-প্রথম তিনজনে ভাগ করে রাখত। শেষ কালে বউরা কানে যে কী ফুসমন্তর দিল, সবাই মিলে আমায় এখানে রেখে দিয়ে গেল। কত করে বললাম, 'ওরে, আমি তোদের মা, আমায় এখানে রেখে যাস নে।'

'তা কী বললে?'

'বললে, এখানে তুমি ভালো থাকবে, মা। স্বাধীন! ছেলেদের বউদের সঙ্গে ঝগড়া হবে না।'

'বউদের তাহলে হোটেলে রেখে এল না কেন?'

'তা কে বলবে, ভাই? বিয়ের পর ছেলেরা পর হয়ে যায়। তখন তাদের কাছে বউই আপন, মা পর!' বৃদ্ধার রুগ্ন গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

চন্দ্রপ্রভার হাঁটুর ব্যাত আবার মাথা চাগিয়ে উঠেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে খুব কষ্ট হতে থাকে। আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে, মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিনি অবশেষে সিঁড়ি অতিক্রম করলেন।

'কী, চা খাওয়া হল?' শেফালিকা বললেন। চিরন্তনী আর শেফালিকা বসে। চিরন্তনীর তক্তপোশের উপর।

চন্দ্রপ্রভা ঘাড় নাড়লেন। নিজের বিছানার উপর গিয়ে বসলেন।

'আসলে প্রত্যেক মানুষের নিজের জন্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। তাহলে মানুষের ব্যক্তি-জীবনের অনেক সমস্যা কমে যায়।' শেফালিকা বলেন। তাঁর আর চিরন্তনীর মধ্যে যে আলোচনা চলছিল, তারই সূত্র ধরে যে এই কথাটা বলা তা বোঝা যায়।

চন্দ্রপ্রভা বড়ো করে হাই তোলেন। 'দুই বুড়ি বড়ো-বড়ো কথা বলছে!' তিনি মনে-মনে মন্তব্য করেন। বিরক্তিকর। জ্বালাবে। একদিকে বাতের ব্যথা, আর-একদিকে এঁদের বুকনি। কাছে তুলো নেই।

থাকলে দু-কানের ফুটোয় গুঁজে দিতেন। যত্তসব।

'কিন্তু সেটা তো স্বার্থপরতা।'

শেফালিকা মিষ্টি করে হাসলেন, 'যুগটাই যে ভাই স্বার্থপরতার। এ যুগে যে স্বার্থপর হবে না সেই-ই মরবে।'

চন্দ্রপ্রভা বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। যত সব কচকচানি। বুড়ি হয়ে মরতে যাচ্ছেন, কোথায় ধর্ম-কর্ম করবেন, তা না বড়ো-বড়ো কথা। চন্দ্রপ্রভা চুপ করে বসে থাকেন। শেফালিকা আর চিরন্তনীর মধ্যেকার কথা চলতে থাকে। 'ওঃ!' চন্দ্রপ্রভা মনে-মনে বিরক্তি প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে বারান্দায় চলে আসেন। সেই বৃদ্ধার ঘরের দিকে যান। বসে-বসে গল্প করবেন। একটা ঘরের ভেতর থেকে নিরবিচ্ছিন্ন কাশির শব্দ বারান্দায় ভেসে আসে। চন্দ্রপ্রভা সেদিকে তাকান। এক অতিবৃদ্ধা দমকে-দমকে কাশছেন। কঙ্কালসার চেহারা। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। দেহে হাড়ের উপর বুঝি শুধু চামড়া।

সকাল যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেলে পড়ে। চন্দ্রপ্রভা ঘর আর বার করেন। আজ কি রন্তু ফেরে নি? হয়তো কিংবা হয়তো নয়। যদি ফিরে থাকে, তাঁর আজই এখানে শেষ দিন।

চিরন্তনী একা বেড়াতে বেরোন। শেফালিকা দুপুরে বেরিয়ে গেছেন। এক পত্রিকা অফিসে তাঁর লেখা জমা দেবেন। এখনো ফেরেন নি।

'বেড়াতে যাবেন নাকি?' চিরন্তনী জিজ্ঞেস করেন।

'না।'

চিরন্তনী বেরিয়ে যান। চন্দ্রপ্রভা বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে বসেন। প্রায়ই সিঁড়ির মুখের দিকে তাকান। আজ নিশ্চয়ই রন্তু আসবে। তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

এখন এই বারান্দায় সারসার কয়েকটা চেয়ার। যাঁরা বাইরে বেড়াতে যান নি তাঁরা সব বসে। সেই অতিবৃদ্ধা ভদ্রমহিলা যিনি সকালে দমকে-দমকে কাশছিলেন, তিনি অবশ্য ঘরের মধ্যেই আছেন। তাঁকে ডাক্তার দেখে গেছেন। তাঁর ঠাণ্ডা লাগানো বারণ। তিনি তাই বাইরে আসেন নি।

সেকেনড, মিনিট, ঘণ্টা কাটতে থাকে। ঝিরি-ঝিরে বাতাস বইছে এখন। চন্দ্রপ্রভা চুপ করে বসে থাকেন। বুকের মধ্যে দুঃখ, অবসন্নতা, রাগ, জ্বালা তালগোল পাকিয়ে এক মিশ্র অনুভূতি ছড়িয়ে আছে। এখনই যে এর জন্ম, এই বিকেলে, তা নয়। এখানে আসার মুহূর্ত হতেই তৈরি হয়েছে। এবং তখন থেকেই মনের সব কোষে-কোষে ছড়িয়ে, জড়িয়ে আছে।

আকাশ হঠাৎ দমকা কালো মেঘে ঢেকে গেল। সেই ঝিরঝিরে বাতাসের জায়গায় ঠাণ্ডা, জোরালো বাতাস ছড়িয়ে পড়ল। সব বৃদ্ধারা এবং চন্দ্রপ্রভাও নিজেদের ঘরে ঢুকে গেলেন। ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তা ছাড়া, একটু পরেই যে বৃষ্টি নামবে, তা বোঝা যায়। মেঘ এখন ঘন কালো, প্রকৃতি থমথমে। চন্দ্রপ্রভা ঘরের খোলা জানালা বন্ধ করে দিলেন।

জোরালো বৃষ্টি ঝমঝম শব্দ করে নামে। রন্তু আজ এল না, সুবিমলও নয়, সুমনার তো কথাই ওঠে না। দিন যায়। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। সাত দিনে সপ্তাহ হয়। চন্দ্রপ্রভা প্রতীক্ষায় থাকেন। সবাইকে বলেন, 'আমার নাতি মাসির বাড়ি থেকে ফিরলেই আমাকে এসে নিয়ে যাবে। আমাকে ছেড়ে সে একদণ্ডও থাকতে পারে না'। প্রতীক্ষার সময়সীমা দিনে-দিনে দীর্ঘতর হয়। নাতি কিংবা পুত্র কেউই আসে না। পথ চেয়ে থাকা ক্রমেই অসহ্য হয়ে ওঠে। চন্দ্রপ্রভা বেরিয়ে পড়েন উদ্দেশ্যহীন।

চারিদিকে 'গেল, গেল' আওয়াজ ওঠে। মিনি-বাসটা দ্রুত আসছিল ঠিকই। তাড়াতাড়ি পা চালাতে পারলে সেটা এসে পড়ার আগেই বিপরীত ফুটপাথে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হত। জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। চাকায় গোটা মাথাটা থেঁতলে, গুঁড়িয়ে গিয়েছে। পরনের থান-ধুতি আর ব্লাউজ অনেকটাই রক্তে লাল। কাপড়ের পুঁটুলিটা দূরে ছিটকে পড়েছে।

চন্দ্রপ্রভা কোথায় যাচ্ছিলেন জানা যায় না।

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা

অরুণা হালদার

হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" আলোচনার শেষ পর্বে এসে এবার হিন্দুধর্ম বিষয়টি দেখা দরকার। প্রশ্ন উঠতে পারে—এ বিষয়টির উপস্থাপনা কেন শেষ দিকে আনা হল, অথবা কেনই-বা তাকে পৃথকভাবে অন্য ধর্ম থেকে দেখা হচ্ছে? সেই কারণগুলি অথবা বিশেষত্বগুলি পাঠকসমীপে উপস্থাপিত করছি। এই প্রসঙ্গে সংলগ্ন চতুর্থ চার্ট সর্বথা মিলিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এ বিষয়ে তত্রোক্ত স্তরভেদগুলি এখানে বিশদ করা হল।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, "হিন্দ্" কথাটা থেকে "হিন্দু" এবং "হিন্দবী" বা হিন্দিভাষা নিঃসৃত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মানুসারে আমরা একটা বড়ো ভাষাগোষ্ঠীকে জানি—সেটার নাম ইন্দো-ইয়োরোপীয় হিট্টি গোষ্ঠী। তার থেকে নিঃসৃত হয়েছে ইন্দো-ঈরানীয় গোষ্ঠী (এবং অবশ্যই ইন্দো-ইয়োরোপীয় অন্যান্য ভাষাবর্গ যা ইয়োরোপীয় দেশসমূহে বর্তমান)। এরও পরে আমরা তৃতীয় স্তরে ইন্দো-ঈরানীয় গোষ্ঠী থেকে নিঃসৃত ইন্দো-আর্য ভারতীয় শাখার সাক্ষাৎ পাই। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই শাখা কোনো আর্থ-সামাজিক কারণে ইন্দো-ঈরানীয় শাখা থেকে পৃথক হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষে এসে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এবং পরে উপনিবিষ্ট হয়। ঈরানীয় ভাষায় "স" ধ্বনি "হ"-এর মতো। এদেশের পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান নদী সিন্ধু। অনুমান হয়, "সিন্ধু" শব্দ জলবাচক ছিল। অর্থাৎ সমুদ্রও সিন্ধু, এবং নদীও তাই। ঈরানীয় প্রতিবাসীরা সিন্ধু শব্দটা হিন্দ্ বা হিন্দু উচ্চারণ করে থাকবে। হিন্দু শব্দের প্রথম নির্বচন পাই এখান থেকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে একই শব্দ ইয়োরোপীয়দের মুখে "ইন্দো", "ইনডিয়া" ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে এখনও আছে। এই ইন্দো-আর্য শাখা বা হিন্দ্-আর্য শাখা যখন আসে, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মোহেনজোদারো-হরপ্পার নাগর সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা উজ্জ্বলভাবে বর্তমান। তার তুলনায় হিন্দ্-আর্যগোষ্ঠী পশুপালক এবং বর্বর সভ্যতার স্তরে। পশুপালন এবং পশু নিয়ে একস্থান থেকে অন্যত্র তারা যেতে বাধ্য হত। সেজন্য তাদের সর্বদাই সচল অবস্থায় থাকতে হত। তারা পূর্বকালীন হিট্টাইটদের সংস্পর্শে এসে লৌহের ব্যবহার আর ঘোড়ার প্রশিক্ষণ শিখেছিল। ঈরানে থাকার সময় তারা অগ্নিপক্ক মাংস বলিরূপে দিত এবং নিজেরাও স্বাদুবোধে তা খেত। সুমেরীয়দের উত্তরপুরুষদের কাছে তারা অনুমান হয় গোপালন, বৃষকর্তৃক প্রজনন ও বৃষপূজা তথা বৃষোৎসর্গ শিখেছিল। মনে রাখা দরকার, বৃষ প্রাচীন কালের একটি বড়ো আবিষ্কার। ক্রীট, ঈজিপ্ট, সুমের-ব্যাবিলন—সর্বত্রই বৃষের শক্তি, বৃষের মাংস সমাদৃত হত। "গো" বা "কাউ" কথাটা মূলত সুমেরীয় "গু"-শব্দ থেকে এসেছে, এবং অর্থও এক। ভারতে আগত হিন্দ্-আর্য শাখা পূর্ব-পূর্ব আদিপুরুষের খাদ্যাখাদ্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, ধর্ম—এসবই এনেছিল। এসেছিল ঘোড়ায় চড়ে এবং লৌহতরবারি নিয়ে। সভ্যতর প্রত্ন-দ্রবিড় এবং আসীরীয় ডাইন্যাস্টির অষ্টম পর্যায়ের সমসাময়িক সিন্ধুসভ্যতার ধারাবাহিগণ তাদের ব্রোনজের অস্ত্রাদি নিয়ে এদের সঙ্গে পারল না। অন্যরা আসত ঘোড়ায় চড়ে প্রবাহের পর প্রবাহের মতো। ঘোড়া তাদের তৎকালীন ট্যাঙ্ক বলা যায়। তাদের ছিল অসামান্য সংগঠনক্ষমতা এবং অসাধারণ কল্পনা-ঐশ্বর্য।

তারা একত্র ভোজন করত অগ্নিতে দগ্ধ অথবা শূল্যপক্ক গোরু বা ঘোড়ার মাংস এবং বালি বা ব্রীহীর পুরোডাশ বা পরোটা-জাতীয় খাদ্য। এগুলি তারা দেবতাদের আহ্বান করত অগ্নির মাধ্যমে এবং অগ্নির মাধ্যমেই এসব 'বলি' উৎসর্গ করত। একত্র খাওয়ার পর্বটাকেই কেউ-কেউ যজ্ঞ বলেছেন। এখনও উৎসবাদিকে "যজ্ঞ" বলা হয়। যেমন অন্নযজ্ঞ। খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর ভাঙ বা সিদ্ধির পানীয় (বা ক্যানাবিস ইনডিকা) বা সোমরস গ্রহণ করা হত। এই বর্বর পশুপালক জীবনের আদিম প্রাণশক্তি ছিল অদম্য। ব্যসন ছিল অশ্ববাহিত রথপ্রতিযোগিতা আর চতুরঙ্গ পাশাখেলা। স্ত্রীলোক এবং সুরা তাদের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী ছিল। এ সমাজে স্ত্রীলোকেরও কিছু দাবি আর কর্তৃত্ব থাকত (অপালা, বিশ্পালা, লোপামুদ্রা যেমন)। জৈবশক্তিই এদের সকল ক্রিয়ার উৎস ছিল বলা যায়। পশুপালক জাতির একক অথবা মিলিত সঙ্গীত এদের মধ্যে গীত হত। অলিখিত এ-সকল সঙ্গীতের অনেকগুলিই সাদামাটা প্রার্থনা। ভারতে উপনিবিষ্ট হবার পর এই বিজয়ী গোষ্ঠীর সঙ্গীতও কালক্রমে ধর্মীয় সঙ্গীত তথা "বেদ" আখ্যা পায়। "বেদ" এবং ঈরানীয় "অবেস্ত" সমার্থক শব্দ। বেদোক্ত রচনা পরের যুগে সংকলিত তথা লিখিত হয়। মুখে-মুখে শুনে-শুনে মনে রেখে চলে আসত বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। জেন্দ্ অবেস্তা এবং বেদ সমার্থক। বেদ মানে যা জানা যায় (বিদ্) বা রিয়লাইজড হয়। বেদোক্ত সূক্তগুলি পড়লে তার প্রাচীনত্ব, অর্বাচীনত্ব ধরা পড়ে। ঋগ্বেদই প্রাচীনতম—তার যে অংশ গীত হত তা হল সামবেদ, এবং যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত মন্ত্র হল যজুর্বেদ। আমরা মনে করি—অথর্ববেদকে গোঁড়ামির দিক থেকে অপাংক্তেয় করলেও অথর্ববেদ তৎকালীন প্রাচীনতর নানা বিদ্যা, যোগচর্যা, ওষধি-ভেষজ, মন্ত্রতন্ত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। কালক্রমে তার ক্ষেত্র হয়েছে বিস্তৃত। অন্যান্য বেদের সঙ্কলন, সংযোজন এবং দার্শনিকতার উত্তরণও লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষের মাটিতে স্থান করে নিয়ে, মোহেনজোদারো-হরপ্পার মতো সুসম্পন্ন নগরজীবনে উপনিবিষ্ট হয়ে আর্য-হিন্দ্ শাখার ব্যক্তিরা পূর্বতন অধিবাসীদের দাসদস্যু নামে অভিহিত করল। কাছাকাছি অস্ট্রোএশিয়াটিক মানুষ বা আদিবাসীদের রাক্ষস আখ্যা দিল। যশক্তিতে এদের নিজিত করে উপনিবিষ্ট হয়ে আর্যশাখা এবার মন দিল শক্তিশালী সমাজ-বন্ধন আর লোকস্থিতি-লোকসংগ্রহের ব্যাপারে। বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ হল তার প্রথমতম পদক্ষেপণ।

বিজয়ী আর্যরা অনেক দেবতার উপাসক ছিল।

ড. অরুণা হালদারের জন্ম ৮ই মে, ১৯১৮। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন রীডার। ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত এবং বাঙলা ভাষা বিষয়ে তিনি ছিলেন রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৬২-৬৪)। লেকচারট্যুর করেছেন জার্মানির হামবোল্ড ইউনিভার্সিটি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ে অনুশীলনের গভীরতা তাঁকে বিশেষজ্ঞের মর্যাদা দিয়েছে।

এ-সকল নাম আমরা ইন্দো-হিট্টি-ইয়োরোপীয় প্যান্থিয়নের (অবশ্যই প্রাক্-খ্রীষ্টান আর প্রাক্-ইসলামও বটে) মধ্যে এখনও পাই। তবে যুগধর্মে সময়ের গতিতে বহু দেবতার নাম থাকলেও কর্ম বা শক্তির পার্থক্য ঘটেছে। ইন্দ্র বলা হত সেনাপতি বা জেনারেলকে। 'ইন্দ'-ধাতু শক্তিবাচক। অনুরূপভাবে মহেন্দ্র, উপেন্দ্র শব্দগুলি বোঝা যায়। এই ইন্দ্র পরে হন দেবরাজ। ইন্দ্রর অন্য নাম পুরন্দর। সেই যুগে শতটি পুর বা সুরক্ষিত গড়যুক্ত নগর-ধ্বংসকারী বীরকে ওই নাম দেওয়া হত। পুর মানে ঘেরা নগর। ইন্দ্র শক্তিমান, পরস্ত্রীলোলুপ, স্ত্রীসম্ভোগে কুণ্ঠাহীন এবং বৃষমাংসপ্রিয়। এই ইন্দ্র গুরুপত্নীকেও ভোগ করেন। পৌরাণিক যুগে তিনি স্বর্গরাজ্যে অপ্সরাপরিবৃত হয়ে বাস করেন। গ্রীক দেবতাদের মতোই ইচ্ছাসুখে তিনি স্বজনপোষণ করেন বা দুর্জনশাসন করেন। দেবরাজ জুপিটর বা জিউসের (দ্যুস্পতি) সঙ্গে তাঁর কিছু মিলও আছে। দ্বিতীয় স্তরে প্রাক্-পৌরাণিক যুগে আমরা তাঁকে ঝড়বৃষ্টির দেবতা হিসাবে পাই। তিনি মহাভারতের যুদ্ধে তাঁর পুত্র অর্জুনকে সহায়তা করেন। আরো পরবর্তী কালে তিনি উপাখ্যানে উক্ত কৃষ্ণবাসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা এনে গাভীদের কষ্ট দেন আর কৃষ্ণবাসুদেব তাদের রক্ষা-কল্পে প্রবৃত্ত হন। বর্তমান কালে ইন্দ্রপূজার স্বল্প প্রচলন কোনো কোনো স্থানে আছে। এই ইন্দ্র অন্যান্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় প্যান্থিয়নে ওডিনের সমতুল্য দেবতা। ওডিন বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম, মিত্র বা সূর্য, বিশ্বদেব উষস্ (স্লাভ আভরোরা বা অভ্রা)—সকলেই ইন্দো-ইয়োরোপীয় প্যান্থিয়নভুক্ত দেবতা। যথাকালে ইন্দো-আর্য বা হিন্দ-আর্যদের মধ্যে তাঁদের ভারতীয় বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটতে থাকে। এ পর্যন্ত তাঁদের হিন্দু দেবতাও বলা সঙ্গত হবে না। লক্ষ করলে বোঝা যায়—পূর্বোল্লিখিত বর্ণনায় (সংগ্রহণপর্ব ও তৃতীয় চার্ট দ্রষ্টব্য) এ-সকল দেবতাই স্থানকালনির্বিশেষে কোনো না কোনো ধরনের প্যাগান ধর্মের গৃহীত দেবতা। প্রত্যেকেই বিশেষ-বিশেষ শক্তিধর। প্রত্যেকেরই বিবর্তন-বিকাশ আছে, আবার অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেবতার সঙ্গে মিলে-মিশে একটা সমন্বিত বা সিন-ক্রেটিক রূপও লাভ হয়েছে। সে কথায় পরে আসছি।

প্রসঙ্গত এও মনে রাখতে হয় যে, ভারতবর্ষ জম্বু-দ্বীপ বা পরের যুগের হিন্দ্ এবং আজকের তথাকথিত হিন্দুস্থান সেই ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জনশূন্য ছিল না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে মোহেনজোদারো-হরপ্পা এবং সংশ্লিষ্ট সভ্যতার ধারক নৃ-গোষ্ঠী ছিল—তাদের বর্তমানে আদি প্রত্ন-দ্রবিড় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের বিশিষ্ট পৌর সভ্যতা ছিল, সুসভ্য সংস্কৃতি ছিল। তাদের এক-প্রকার লিপি ছিল যা আজকের দিনে ভারতে পরিচিত ব্রাহ্মী লিপির আগের রূপ।

বর্তমানে ভারতের এবং পূর্ব এশিয়ার অনেক লিপি এই লিপিরই পরিবর্তিত-পরিমার্জিত রূপ। অনেক পণ্ডিতের মতে, এই লিপি ফিনিসীয় বণিক-দের লিপির সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিল। তা যদি হয়, তাতে করে এ লিপির প্রসার আরো বেড়ে যায়। তবে এ নিয়ে কথা বলতে গেলে তা প্রসঙ্গচ্যুতির কারণ ঘটাবে। তাদের শিল্প-সংস্কৃতি আর নগরস্থাপত্য সেদিনের পক্ষে বা আজকের দিনেও উচ্চমানের ছিল বলা যায়। এই নৃগোষ্ঠীকে প্রত্ন-দ্রবিড় বলে চিহ্নিত করা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, (ক) বহু নৃগোষ্ঠীর করোটী পাওয়া গেছে এখান-কার কবরভূমিতে। ড. গুহ মহাশয়ের মতে, এখানে বহুজাতিক ভিত্তিতে জনসমাগম হত—তার মধ্যে ফিনিসীয় বণিক বা পণিরা ছিল। আসীরীয় সম্পর্ক-জনিত অসুর নামটি থেকে গিয়েছিল এবং ইন্দো-আর্যগণ তাদের অসুর বলত। ঈরান থেকে আসার কালেই অসুর বা অহুরমজদ সম্পর্কে তারা বিরূপ ধারণা নিয়ে এসেছিল। এখন এখানকার লোকরাও তাদের কাছে অসুর আখ্যা পেল। তবে এদের পশু-পালক পর্যটক সংস্কৃতি সত্ত্বেও এই অসুর-সভ্যতার

বিস্ময়কর স্থপতিকলা আর নির্মাণকৌশলকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে। পরবর্তী কালের দেবাসুরসংঘর্ষ বারবার ঘটেছে এবং পুরধ্বংস হয়েছে। দেববাদিগণ এই অসুর বা দানবদের (ময়দানব যেমন) দিয়েই রাজবাড়ি, পুরনগর নির্মাণ করিয়েছে। এ তথ্যের পোষকতা পুরাণে মিলবে। অবশ্য দেববাদীদের বিশ্বকর্মা (ভালক্যান) বা দেবশিল্পীও ছিলেন, ছিলেন আয়ুর্বেদাচার্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। কিন্তু কার্যকালে দেবগণ দৈত্য বা অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যকে স্মরণ করতেন। শুক্রাচার্য ভিষগাচার্য ছিলেন—সম্ভবত শল্যবিদ্ও ছিলেন। তিনি মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা চর্চা করতেন। দেবগুরু বৃহস্পতিপুত্র কচ তাঁর কাছে এ বিদ্যা শেখার জন্য গুরুগৃহে বাস করেন।

"পুর" বা নগর ছিল এক-প্রকার সিটি-স্টেট—এটা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সঙ্গে জড়িত। মাঝখানে দেবমন্দির, চবুতরা, ধর্মগোলা, শস্যভাণ্ডার, সৈনিক-দের ব্যারাক এবং রাজপ্রাসাদ—সবই সুপরিকল্পিত ছিল। আরো ছিল সোজা পথঘাট আর জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং পয়োনালীর ব্যবহার। ছিল সাধারণ স্নানাগার বা সুবৃহৎ ঘেরা জলাশয়—এগুলি সবই পূর্বোক্ত মেডিটেরানিয়ান সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করা অসঙ্গত হবে না। সিন্ধুসভ্যতা, অনুমান হয়, সিন্ধুনদের আর তার শাখা-প্রশাখার আর জলসেচ-খালের উপর নির্ভরশীল ছিল। জলের সমস্যা কঠিন হওয়াতে এত বড়ো সভ্যতা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিন্দ-আর্য আক্রমণ সেই ক্ষতিকেই আরো প্রবলতর করে। ধ্বংস করে বললেও অত্যুক্তি হবে না। তবে এই মানুষেরা দীর্ঘকাল বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে দক্ষিণ ভারতে বাস করে। দক্ষিণ ভারতে যে প্রবল এবং বিশাল দ্রবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতির পত্তন হয়, তা যে আদিতে মোহেনজোদারো-হরপ্পার সম্পর্কিত ছিল, নানা কারণে তা অনুমিত হয়। তার একটা কারণ হল অবশ্যই ধর্মমত। হিন্দ-আর্যগণ ভয়ে এবং আগ্রহে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিজিত জাতির পরাক্রমকে না মানলেও ধর্মমতটাকে না মেনে পারে নি।

উপরি-উক্ত ধর্মমতানুসারে আমরা দেখি, এখানে একপ্রকার প্রাচীন প্রাক্-আজীবিক (অবশ্যই প্রাক্-বৈদিক) ধর্মমত আর যোগাভ্যাস প্রচলিত ছিল। পদ্মাসনসহ যোগিমূর্তি উৎখনিত নানা দ্রব্যের মধ্যে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে আদি পশুপতিমূর্তি—এ মূর্তির ললাটসংলগ্ন বাইসনশৃঙ্গ (বাঁকা চাঁদের মতো দেখায়), পরে এ মূর্তির নাম চন্দ্রচূড় বা চন্দ্রমৌলি হয়। মূর্তির গায়ে হাতি বা বাঘের চর্মাবরণ। দুই পায়ে বিষাক্ত সাপ জড়ানো এবং দুটি হাতে অক্ষ-মালার মতো সংলগ্ন হয়ে আছে বিষাক্ত বৃশ্চিক। তাঁর চারপাশে মৃত্যুপরায়ণ হাতি, বন্যবরাহ, গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুকুল হিংসা ভুলে আছে। ইনিও ধ্যানী-মূর্তিতে আসীন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁকে বলেন প্রোটো-শিব। আমরা বলি, পশুপতি শিবের কল্পনা শুধু নয়, অহিংসার কল্পনাটিও এসেছে এখান থেকে। পশুরা হিংসা ভুলে গেছে—এ মূর্তির চার-পাশে। এই পশুপতি ব্যতীত মহামাতা বা ম্যাগনাম মেটার-এর প্রতিমা আছে। তাঁর বিশাল স্তন এবং সুবৃহৎ যোনি জননব্যাপারের পরিচায়ক। অন্য একটি মূর্তিতে স্ত্রীদেবতার নিম্নদেশে জননেন্দ্রিয় থেকে নির্গত কিছু চারাগাছের মতো দেখা যায়। এ দেখে মনে হয়—ইনি উর্বরতার প্রতীক। সম্ভবত ঈশতার ও কুবিলীর মতোই ইনি কোনো প্রতীক-দেবতা। পাওয়া গেছে বিশাল বৃষমূর্তি যা বীর্যের প্রতীক—জননশক্তির পরিচায়ক। এবং এ বৃষের পূজা এবং বৃষোৎসর্গও ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে তথা মিশরে তৎকালে প্রচলিত থাকার কথা। লিঙ্গপূজা বা ফ্যালিক ওয়র-শিপের নিদর্শনও আছে। অন্যান্য যা মূর্তি মেলে, তার মধ্যে পূর্বোক্ত কটিই প্রধান। ঠিক দুর্গা না হলেও সিংহ বা ব্যাঘ্রসহ মিনার্ভা-মূর্তির মতো কিছু রণরঙ্গিনী-মূর্তিও পাওয়া গেছে। দেবীগণ বস্তুত হিন্দ-আর্য প্যান্থিয়নে প্রথমে ছিল না। পুরুষপ্রধান নৃকুল সেটা। অপরদিকে মনে হয়, সিন্ধুসভ্যতার দেশে

জননীশক্তির পূজা স্বীকৃত ছিল। প্রজননক্রিয়ার দুটি উপাদান স্থূলভাবে হলেও তাদের কাছে উপাস্য বলে মনে হয়েছিল। লিঙ্গপূজা-যোনিচর্যাও একপ্রকার তন্ত্রসাধনার উৎস। সমসাময়িক চীনদেশের প্রাচীন উপাসনায় য়িং ও য়িন স্বীকৃত ছিল। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় হোক, বিজিত এ জাতির দেবতাসমূহকে হিন্দু-আর্য দেবসমাজ গ্রহণ না করে পারে নি। সুতরাং ইন্দো-ইয়োরোপীয় এবং হিন্দু-আর্য দেবতা রুদ্র ঝড়ঝঞ্ঝার দেবতা, আবার যিনি স্বভাবত পশুকুলের রক্ষকও, সংযোজিত হলেন পশুপতি মহাদেবের সঙ্গে। আদিদেব বা লিঙ্গোপাসনার মধ্য দিয়ে মহামাতাসহ তাঁর যৌনমিলনমূর্তি স্বীকৃত হল। আজও তা হিন্দু-দেবসমাজে পূজিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই সংযুক্তি কিন্তু যৌন সহবাসের মূর্তি হয় নি। হিন্দু মন্দিরে শিবপ্রতিমা বিরল—সেখানে লিঙ্গমূর্তি এবং যোনিপীঠ থাকে—দেখলে বোঝা যায় যে এখানে লিঙ্গের মূলদেশই যোনিতে প্রোথিত। অর্থাৎ এ মূর্তির বক্তব্য হল—যোনি থেকেই লিঙ্গ বা পুরুষেরও উদ্ভব। মহামাতার কল্পনাটি এখানে বড়ো কথা। তখনকার এই মাতৃতন্ত্র কোনো না কোনোভাবে আজকের দ্রবিড় সংস্কৃতির মধ্যে সজীব হয়েই টিকে আছে।

পৌরাণিক যুগের বিরোধী বীর রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর ছিলেন। লঙ্কা বা অযোধ্যা কোথায় ছিল তা নিয়ে বহু দেশ গত দ্বিদশক পূর্বে দাবি করে। ওই সময় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রামায়ণ গ্রন্থখানি বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত এবং গোঁড়া হিন্দুসমাজে নিন্দিত হয়েছিল। আচার্য সুকুমার সেন বলেন, রামায়ণের বীজতলা ফ্রিজিয়া (ভৃগু) এবং সুনীতিকুমারের মতে, রাবণের কল্পনায় গ্রীক-রোমীয় হাইড্রাহেড ও ত্রিশিরার দূর প্রভাব থাকা সম্ভব। মনে হয়, পূর্ববর্ণিত দ্রবিড় সভ্যতা আর দক্ষিণীরাজ্যের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অর্ধ আর্যসন্তান শ্যামবর্ণাভ শ্রীরামচন্দ্রের যে যুদ্ধ হয়, তা আর্য-অনার্যের যুদ্ধ হলেও রামের সঙ্গে আর-এক ভিন্ন শ্রেণীর টোটেমিক অনার্য আদিবাসী ও শবর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকও যুক্ত ছিল। আমরা জানি যে, রাবণ শিবপূজক ছিলেন এবং তাঁর পুত্র মহামায়ার উপাসনা করে যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন। এসব কথা-কাহিনী থেকে পাঠককে তৃতীয় নেত্র ব্যবহার করে সামান্য স্বল্প কিছু তথ্য খুঁজে নিতে বলি। আর বলি দুটো কথা। তার একটা হল প্রথমাবধিই তথাকথিত আর্যানার্যের সংঘর্ষ সত্ত্বেও স্বাভাবিক সংমিশ্রণ ঘটেছিল, বিশেষ করে ঘটেছিল ধর্মক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয় কথাটা হল—এই মিশ্রণ বর্তমান পর্যন্ত আজকের হিন্দুধর্ম-ভাবনার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এইরকম পরিপ্রেক্ষিতেই কি আমরা আজও বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমির ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে পারি না? দিল্লিতে বা অন্যত্র অনুষ্ঠিত রামলীলার শেষানুষ্ঠানে রাবণদাহ বলে একটা ব্যাপার আছে। (যেমন আজকাল মন্ত্রীদের কুশপুত্তলী দাহ করা হয়ে থাকে।) এটি দ্রবিড়-সভ্যতাভিমানীর কাছে প্রীতিপ্রদ নয়, বরঞ্চ একান্ত অবাঞ্ছনীয়। আমরা মধুসূদন দত্তের কাব্যপাঠে রাবণকে যতটা বীরোচিত দেখতে পাই, রামচন্দ্র ভগবান হওয়া সত্ত্বেও ততটা উজ্জ্বল নন। নারীহরণ (বা সীতাহরণ) সেইকালে খুব অস্বাভাবিক ছিল না। অন্তত নৃগোষ্ঠীর মধ্যে তা স্বভাবদর্পের বিভব দেখানোর জন্য প্রায়ই ঘটত। জৈন রামায়ণে রামসীতা ভ্রাতাভগ্নী কল্পিত। সীতাকে কোথাও রাবণকন্যা বলে দেখানো হয়েছে। উভয় তথ্যই দ্রবিড় সমাজের মাতৃতন্ত্রে প্রচলিত আছে কোনো না কোনোভাবে।

প্রত্ন-দ্রবিড় দেবসমাজের আর-একটি দেবতা বিষ্ণু বা ভেণহু বা নীলদেবতা। তিরুপতি কথাটা শ্রীপতি। ভেঙ্কটেশ্বর কথাটির অর্থ হল সুন্দর ভগবান। বৈদিক দেবতা নগরসভ্যতার দেবতা বিষ্ণু, প্রাচীনতর দেবতা নারায়ণ (ঋষিকল্প) কালক্রমে একত্র হয়ে যান। তৎসহ যুক্ত হয় কৃষ্ণবাসুদেবের কল্পনা। বাসুদেব যাদব ক্ষত্রিয় অর্থাৎ গোপক্ষত্রিয়। কৃষ্ণজননী দৈবকী অসুরদুহিতা, কংসাসুরের ভগ্নী। দৈবতসন্তান কৃষ্ণবাসুদেবের জন্ম কারাগারে। মাতুল তাঁকে মেরে ফেলার আগেই তিনি নন্দগোপরাজের কাছে ব্রজগোকুলে আশ্রয় পান। যে কারণেই হোক, নাগকুল (এও টোটেম মানুষ) তাঁর সহায়ক হয়। নানাভাবে মৃত্যু এড়িয়ে তিনিই কংসবধ করেন। জরাসন্ধ অর্থাৎ রাজগৃহরাজ ও কংসের শ্বশুরও তাঁর হাতে নিহত হন। কৃষ্ণবাসুদেব একদিকে গোপীজনবল্লভ অপরদিকে তিনি আর্য দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ঝড়বৃষ্টি থেকে গোরক্ষা করেন। পরিশেষে মনে হয় তিনি এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই দুইজনা মহাভারতযুদ্ধের পরিকল্পকও বটে এবং তাঁরাই যেন মহাভারতকথার উদ্‌গাতা। মহাভারতযুদ্ধের সময় ধরা হয়—১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (ভিন্তারনিৎজ)। এটি এক সর্বভারতীয় যুদ্ধ। তাতে মনে হয় একটা আর্য-অনার্য সংঘর্ষও তলে-তলে ছিল। আর্যাভিমানী কুরুগণ আর তাঁদের সংশ্লিষ্ট রাজারা (যেমন শিশুপাল, যিনি কৃষ্ণের সম্পর্কে ভ্রাতাও) খোলাখুলি কৃষ্ণকে হত্যা করতে চান। পরে নিজেই নিহত হন। ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অপরদিকে তখন জুডিয়াতে সলোমন ডেভিডের রাজ্যকাল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণবাসুদেব দুজনেই মিশ্রবংশের জাতক—কৃষ্ণের সঙ্গে নাগবংশ সৌহার্দ রক্ষা করত। মহাভারতের শান্তিপর্ব এবং গীতা পরের যুগের প্রক্ষিপ্ত কিনা, এ বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু নিঃসংশয়ভাবে বলা যায় যে, তথাকথিত সমন্বিত হিন্দুধর্মের বীজ আমরা সঙ্কলিত মহাভারতের মধ্যে পাই। তবে ধর্মরাজ্য কথাটাই প্রযুক্ত হয়েছে—হিন্দুরাজ্য নয়।

সমন্বয়ের অন্য দিকটাও বিবর্তিত হচ্ছিল। শুধু যুযুধান রাজ্যগুলি নয়—সাধারণ মানুষের কাছে আসার ব্যাপারটা, ব্যবহারিক উপযোগিতা, বিবাহাদি—এগুলিকে তো অপরিহার্য বলেই ধরতে হবে। সুতরাং আর্যত্ব-অনার্যত্ব মিশে যেতে লাগল। লক্ষণীয় এই যে, কৃষ্ণবাসুদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শুধু মিশ্র পিতামাতার থেকে জন্মই হয় নি—তাঁরা পূর্বদেশীয়দের মতো কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীরামচন্দ্রও তাই। ক্ষত্রধর্মের অভিমান, পুরুষশাসনের প্রাধান্য এবং বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ ব্যতীত অন্যান্য সব দিকেই তখন শিথিলতা এসেছে। খাদ্যাখাদ্যগ্রহণ এবং বিবাহাদি ব্যাপারে রাজপরিবারে সর্দার পরিবারে এবং সাধারণ্যে তখন আগ্রহ জেগেছে। সবচাইতে সমন্বয় হয়েছে ভাষার ক্ষেত্রে আর পরবর্তী কালে লিপির ক্ষেত্রে। দ্রবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বাঙ্গীকরণের ফলে দেখা যাচ্ছে অধুনা প্রচলিত উত্তরভারতীয় ভাষাগুলির শব্দসম্ভার যাই হোক না কেন, তার সিনট্যাকস হল প্রত্ন-দ্রবিড় বা প্রত্নতমিল ভাষা থেকে পাওয়া। আর শব্দসম্ভার সম্বন্ধে আমরা দেখি ড. কুইপার রচিত এবং ড. কিরকেল মেমোরিয়ল সংখ্যায় লিখিত একটি নিবন্ধ। সে নিবন্ধের নাম "লোন ওয়র্ডস ইন ঋগ্বেদ"। মূল আর্যদের আগমনের পরে থেকে বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত বেদপাঠ (সংহিতাপাঠ, মন্ত্রপাঠ, ঘনপাঠ, জটাপাঠ ইত্যাদি) ও বেদাঙ্গপাঠই চলে আসছিল। কিন্তু প্রয়োজন বড়ো বালাই। এদেশের সব শব্দ বা জিনিসের ব্যবহারাত্মক শব্দ যা আর্য ভাষায় মেলে নি তা সেই বৈদিক সময়েও বৈদিক আর্যদের গ্রহণ করতেই হয়েছিল। সেসব শব্দের মধ্যে উক্ত প্রবন্ধে দেখা যাবে দ্রবিড় শব্দই বেশি এবং এগুলি বর্তমান কালেও উপলব্ধ (দ্রষ্টব্য উল্কা, শিশির ইত্যাদি ইত্যাদি)।

বৈদিক আর্য এবং প্রত্নদ্রবিড় সংশ্লেষণ সর্বভারতীয় স্তরে আরো একটি বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। এটি হল পূজা বা উপাসনা। যাযাবর আর্যগণ যজ্ঞ করত। যজ্ঞবিধি জানত। অগ্নিচয়ন-অগ্নিসংরক্ষণ করত। অগ্নিসহ অন্য দেবতাদের স্তবস্তুতি করে, তুষ্ট করে প্রার্থনা জানাত। প্রত্ন-দ্রবিড়দের কাছে তারা পেল পূজা (পুষ্প) ও উৎসর্গ। ফল-জল-ফুল দিয়ে ইষ্টকে আরাধনা করা। এ ব্যাপার ছিল তাদের অজানা। এই উপাসনা এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ শুধুমাত্র পূর্বে কথিত থীইজম দিয়ে বোঝানো যাবে না। সম্ভবত এই সুকুমারতাপূর্ণ আত্মনিবেদন দ্রবিড় সংস্কৃতির বিশিষ্টতা। তাঁদের মধ্যেই পরে বৈষ্ণব আড়োয়ারগণ

এবং শিবভক্ত নয়নমারগণের আগমন হয়। তাঁদের নীতিশাস্ত্র "কুরল" পঞ্চম বেদতুল্য। আর্যগণ নূতনভাবে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। উপনিষদ বেদ ও যজ্ঞের বিরোধী হয়েছে। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমাগত বৌদ্ধমত এবং তার বহুপূর্ব থেকে চলে আসা আজীবিক মত আসমুদ্রহিমাচলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে আর রাজানুকূল্য পেয়েছে। আত্মসংরক্ষণ এবং সংশ্লেষণ মিলিয়ে মনে হয় তথাকথিত আর্যজাতি আর পৃথক থাকতে পারল না। আগে যাদের ব্রাত্য বলা হত, তাদেরও শুদ্ধীকরণ হতে লাগল। তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং পরবর্তী পালসাম্রাজ্যের আনুকূল্যও তারা পেল—তখনও অবশ্য হিন্দু নামটা পায় নি।

বস্তুত, আর্যগণ ভারতে আসা এবং তাদের এক মিশ্রভাষাভাষী মিশ্রনুকুলে পরিণত হবার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো উপাদান হল এই প্রত্ন-দ্রবিড় কুল। সমস্ত দক্ষিণভারত শুধু নয়, উত্তরভারতেও তারা উপনিবিষ্ট ছিল। ছিল তাদের ধর্মমত এবং মঠজাতীয় আশ্রমও। আজকের জৈন নিঃসৃত হয়েছে আদি প্রত্ন-আজীবিক সম্প্রদায় থেকে। তীর্থঙ্কর গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্তির কথা আগেই বলেছি। বলে এসেছি যে স্বয়ং বুদ্ধও কিছু সময় অতিবাহিত করেন বৈশালীতে তীর্থিক আরাড় কালাম এবং রাজগৃহে রুদ্রক রামপুত্রের সন্নিধানে। এসব সম্প্রদায়ের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁকে আগ্রহান্বিত করে নি। তবে যজ্ঞীয় পশুবলির মধ্যে যে প্রকট নিষ্ঠুরতা, তা এই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ জৈন এবং বৌদ্ধ মতের অগ্রহণীয় ও অমানবিক মনে হয়। সুতরাং প্রজ্ঞামার্গী মানবিক বৌদ্ধমত এবং আনন্তর্যমার্গী আপেক্ষিকতাবাদী জৈনধর্ম প্রথমাবধি মিশ্র আর সংশ্লেষাত্মক প্রাক্-হিন্দু বিচারে শত্রুভাবাপন্ন বলে কল্পিত হল। সম্রাট অশোক এবং হর্ষবর্ধনের পর রাজানুকূল্য কম হতে থাকে। বৌদ্ধমত এবং প্রাক্‌হিন্দুমতের শাস্ত্রার্থও হত। অনেক ক্ষেত্রে শর্তসীমা থাকত—বিজিত ব্যক্তিকে তপ্ততৈলে মৃত্যুবরণ করতে হবে আর না হলে তুষানলে। ক্রমশ মনে হয় বৌদ্ধদের বিতাড়িত হতে হয়। তাদের মঠস্তূপ ইত্যাদি তৎকালীন প্রাক্-হিন্দুকবলিত হয়। বেশির ভাগ স্থানেই বৈষ্ণব মন্দির গড়ে ওঠে যেমন মথুরা, বৃন্দাবন, পুরীধাম, দক্ষিণভারতের অধুনা বিষ্ণুক্ষেত্রগুলি। নির্যাতনশেষে এদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা প্রাণপ্রিয় পুঁথিগুলিসহ পশ্চিমে গান্ধার, কাশ্মীর, উজবেকিস্তান, এশিয়া মাইনর পর্যন্ত যান—পূর্বে যান নেপাল হয়ে উত্তরাপথে তিব্বত-মঙ্গোলীয়-চীন-কোরিয়া-জাপানে; দক্ষিণভারতে আর শ্রীলঙ্কায় পূর্বেই তাঁরা (স্থবিরবাদী যা প্রাচীনতর গণ) গিয়েছিলেন। হাঁটা পথে মনে হয় অসম, ব্রহ্ম, মালয়দ্বীপপুঞ্জ, ভিয়েৎনাম ও কম্বোডিয়াতে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলে যাঁরা গেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই মহাযানী। ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই বিতাড়ন চলে। ততদিনে হিন্দু নামটা স্বীকৃত হয়েছে। হিন্দুধর্মও বুদ্ধকে তথা বুদ্ধানুশাসনকেও নিজের আয়ত্তে এনেছে। বুদ্ধকে নবম অবতার করে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধমূর্তিগুলি কোথাও শিব, সূর্য বা বিষ্ণু বলে পূজিত হলেন। শুধুমাত্র ধর্মপূজার একটা আচার নিশ্চিতভাবে তথাকথিত নিম্নজাতীয়দের মধ্যে হিন্দুসমাজে রয়ে গেছে। বৌদ্ধমতের কথা আগেই বলেছি। কোনো ক্রমেই হিন্দু মতের আত্মার অবিনশ্বরতা, ঈশ্বর এবং কার্যকারণবাদ এবং নিত্যবস্তুত্বের সঙ্গে বিপরীত মতের বৌদ্ধধর্মকে মেলানো যায় না। বর্তমানের বহু হিন্দু পণ্ডিতও এই মত পোষণ করেন। বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলাম সম্বন্ধে যে আলোচনা আগে করে এসেছি, তার পুনরাবৃত্তি এখানে করব না। তবে ভারতের ও বিশেষত পূর্বাঞ্চলের নিপীড়িত বৌদ্ধগণ একটু স্বস্তি আর সহানুভূতির জন্যই বহুক্ষেত্রে সুফী সন্তদের চরিত্র দেখে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হন। দুই ক্ষেত্রেই জাতিভেদের অভিশাপ নাই। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন পুরীধামে, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্মের প্রতীক ধরা হয়। ওখানকার মন্দির দেখলে স্তূপের কথাই বেশি মনে পড়ে।

বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে যাই হোক, জৈনধর্মের ক্ষেত্রে ঠিক কী কারণে জানি না, সাক্ষাৎভাবে হিন্দুধর্মবিরোধিতা নাই। বিরোধিতা বৌদ্ধধর্মও করে না। (বিরোধ আসে প্রধানত হিন্দুদের কাছ থেকে।) কেন আসে সে আলোচনা উপসংহারে করব। আপাতত এইটাই দেখা যায় যে, কালক্রমে জৈনধর্ম প্রায় একরকম করে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। জৈন দর্শনের কথা পৃথক রয়ে গেছে। অবশ্য যোগ বা ধ্যান বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দু—তিন ক্ষেত্রেই আছে। হিন্দুই তা উপযুক্তদের থেকে গ্রহণ করে থাকবে। জৈনধর্ম এককালে দক্ষিণভারতব্যাপী ছিল—বৌদ্ধধর্মও সেখানে কম প্রচারিত ছিল না। এগুলি লুপ্ত হয় কালক্রমে দ্রবিড়গণ হিন্দু হয়ে ওঠার ফলে। সর্বভারতীয় প্রসারণায় হিন্দুধর্ম পরিব্যাপ্ত হল কিন্তু ভারতীয় ঐক্যের তা সহায়ক হয় নি—হল না।

সমগ্র পূর্ব এবং পূর্বদক্ষিণাঞ্চলব্যাপী যে অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল এবং আছে—তাদের কথা বলছি। তারা অস্ট্রোনেশিয়ানদের দূর জ্ঞাতিও বটে। অর্থাৎ সমগ্র প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ—মালয়-ব্রহ্ম-তাইল্যাণ্ডের অংশ এবং অসম নিয়ে বঙ্গ-অঙ্গ-কলিঙ্গ-ত্রলিঙ্গ বা অন্ধ্র থেকে আরো দক্ষিণে যে নুকুল, তাদের মধ্যেও সনাতন ধর্মভাবনা-ওষধিভেষজ, জীবকে টোটেম বলে গ্রহণ করা—এসবই ছিল। তত্পরি ছিল বিচিত্র একটা জীবনবোধ বা জীবনবেদ বা স্থিতিশীলতা। এই নমনীয়তা এদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ থেকে বাঁচিয়ে প্রায় নিরুপকরণ অথচ শান্তশোভন উপাদানে সঞ্জীবিত রেখেছে। মানবতথা ভারত-সংস্কৃতিতে এদের গ্রামীণ সভ্যতার দান স্বীকার্য। ভারতীয় ধর্মে যে কর্মফলবাদ, তা এদের থেকে প্রাপ্ত। এদের বিশ্বাস যে আত্মার মতো কিছু অস্তিত্ব দেহ থেকে দেহান্তরে প্রবেশ করে—এটিও তাদেরই সংস্কার যা উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে হিন্দু মনন গ্রহণ এবং বহন করে চলেছে। এদেরও অসংখ্য দেবদেবী, গাছ-পাথর-কাঠের মূর্তি, পশুদেবতা বড়হম (ব্রহ্মা কি?) কোনো না কোনো ভাবে হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে এসে মিশে আছে।

পূর্বকথিত শিবের সিনক্রেটিক চিত্রটি নির্মিত হয়েছে ইন্দো-আর্য-রুদ্র (স্লাভ রুদিন)+প্রত্ন আদিদেব পশুপতি এবং লিঙ্গমূর্তি+অস্ট্রো-এশিয়াটিকদের থেকে পাওয়া গণ, ভূত, প্রেত প্রভৃতির অধিপতি নিয়ে। এই প্রমথেশ বা শিবসর্পদেবতা এবং আদি ভিষগরাজের উৎস সেটিও এই অস্ট্রো-এশিয়াটিক কল্পনানুসৃত।

এই সঙ্গে চতুর্থ বর্গটিও যোগ করে দেওয়া যাক। হিমালয় পর্বতের ২৫০০ মাইল দৈর্ঘ্যবিস্তারে ভারতের উত্তরাঞ্চলে এখনও পরিদৃশ্যমান এই নুকুল এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর পীত বা পিকিং মানবসন্তান যারা তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু হিসাবে একটা সুবৃহৎ নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। অনুমান করা সঙ্গত যে, বুদ্ধ এই গোষ্ঠীর বংশজ। এ গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বন্যভাবের সঙ্গে আছে শিকারপ্রবণতা আর নৃমুণ্ডশিকারের সঙ্কল্পও। তাদের জীবন থেকে পাওয়া একপ্রকার হিমশীতল সঙ্কল্পসহ মিশ্রিত হয়েছে ঔচিত্যবোধ। এই ঔচিত্যবোধের উপর তাদের ধর্মভিত্তিও রচিত। জীবন একটা মাঝামাঝি স্থিতি বা গোলডেন মীন—এই তাদের প্রধান দর্শন। এইজন্য তারা বৌদ্ধদর্শনকেও সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল বলে আমরা মনে করি। তাদের দেবদেবীও প্রচুর। তন্ত্রমত, মহাকাল, মহাকালিকা, তারা, বজ্রতারা, হেরুক-বজ্র, নীল-সরস্বতী প্রভৃতি আজকের হিন্দুদেবতা আদিতে এই তুর্ক, মোঙ্গল, তাতার প্যাস্থিয়নভুক্ত বলে মনে হয়। হেরুককে বর্তমানের অর্ধনারীশ্বর বলা যেতে পারে। যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয়, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী এই ডমরুধারী জটাজুটশোভিত দেবতার হাতে ত্রিশূল এবং বৃষ বাহন ছিল। মধ্য এশিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত এরূপ মূর্তি চামড়াতে বাঁধানো পুঁথির মলাটে (মঙ্গোলীয়) মুদ্রিত দেখেছি লেনিনগ্রাদস্থ আর্মিতাজ

মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে। তাঁর পরনে শীতের দেশের ভারী পোশাক, চামড়ার বুট, হাতে ত্রিশূল এবং বৃষের সন্নিকটে তিনি দণ্ডায়মান। এইবার আমাদের হিন্দুমতের শিবের কল্পনা সম্পূর্ণ হল।

মনে হয়, ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর লোকেদের সমতলের লোকদের সঙ্গে পর্বতাঞ্চলের লোকেদের (ক্রৌঞ্চদ্বীপ) সংঘর্ষ লেগে থাকত। আবার তাদের দেবতাদেরও অস্বীকার করা যেত না। পর্বতাঞ্চলে আর্যসম্প্রদায়ের ঋষিগণ, ঋভুগণ, গন্ধর্ব-যক্ষ প্রভৃতির বাস ছিল। কিন্নরদেশ কথাটারও উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে কৈলাসের। আর্যদের একজন প্রজাপতি দক্ষ। তাঁর অনেক কন্যা। তার মধ্যে সাতাশটিই এমতে চন্দ্রের পত্নী। অন্য কন্যা সতী—শিবের অনুরাগিণী হন এবং পিতার অমতে শিবের গৃহিণী হন। শিব কথাটা মঙ্গলের দ্যোতক (নাকি মোঙ্গলের?)। দক্ষ তাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। পিতৃগৃহে সমাগতা কন্যা সতীকে তিনি স্বামীর কারণে অবমাননা করেন। সতী যেভাবেই হোক যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। এ সংবাদে শিব ক্রুদ্ধভাবে অনুচরসহ এসে যজ্ঞ নষ্ট করেন, দক্ষকে ছাগমুণ্ডধারী করে সতীদেহ নিয়ে চলে যান। শোকার্ত শিব এই দেহ বহন করে যাবার কালে বিষ্ণু চক্রদ্বারা তা টুকরো-টুকরো করেন। বিক্ষিপ্ত এই টুকরোগুলির অবস্থান নিয়ে ৫২টি শক্তিপীঠ কল্পিত হয় এবং তন্ত্রমতে সেখানে দেবীপূজা হয়—ভৈরব বা শিবসহ। এসব পীঠ—বেলুচিস্তান থেকে কামাখ্যাস্থান পর্যন্ত, আর হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত কল্পিত হয়। এরপর 'সতী' জন্মান্তর প্রাপ্ত হন। তাঁর জন্ম হয় নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা হিসাবে। তিনি তপস্যা করে শিবকেই প্রাপ্ত হন। এবার এই বিবাহে আর্যদের কুলীন সপ্তর্ষি, নারদ মুনি, স্বয়ং দেবতাগণ সকলে শিবসহ বরযাত্রায় শামিল হন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কবি কালিদাস-লিখিত "কুমারসম্ভব" নাটকে এই কাহিনীর অনবদ্য বর্ণনা আছে। দম্পতির সন্তান কার্তিকেয়। তারকাসুরবধ করার আশায় এই ব্যবস্থা। এই দেব-দম্পতির আরো এক সন্তান গণপতি—বিশেষ কারণে গজমুখ প্রাপ্ত হন। তিনি বিঘ্নের তথা বিঘ্নবিনাশের দেবতা। তাঁদের বাসস্থান কৈলাস—শীতপ্রধান স্থান।

এ কাহিনীকে পরিণতি দিয়েছে দুর্গাপূজা। সেখানে লক্ষ্মী বা শ্রী তাঁদের কন্যা, অপর কন্যা ধী বা সরস্বতী। লক্ষণীয় যে শ্রী বা লক্ষ্মীর সমার্থক শব্দ—লাকমে বা লাইমে (শ্লাভ) ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দও বটে। শেষ দিকে এই দুর্গার কল্পনা সম্পূর্ণ হয়—বিহার অঞ্চলের 'অসুর'দের মধ্যে প্রাপ্ত লোক-কথায়। তাদের ঠাকুরানী বা ঠাকুরান তাদের সর্দার হু-দুড়-দুর্গাকে পরাস্ত করে দুর্গা আখ্যা প্রাপ্ত হন। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে দুর্গাসুরবধের কথা আছে।

ইতিহাস অদ্ভুত বলে না, যদি না তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়। কিন্তু পুরাণ বা লোককথা ইতিহাস নয়। ধর্মধারণার মধ্যে তাই ইতিহাস-প্রতিষ্ঠার কল্পনা একপ্রকার স্বপ্নমাত্র। তার দার্শনিক ব্যাখ্যার একটা পরম্পরা গঠিত হতে পারে মাত্র। আমরা সেই রীতিতে এ পর্যন্ত চলে এসেছি। বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো কথা হল হিন্দুধর্মের একটা তিন হাজার বৎসরের পরম্পরা থাকাতে, তাকে অনুসরণ করা বড়ো জটিল। অনেকগুলি নৃগোষ্ঠীর প্যাস্থিয়ন এর মধ্যে এসে মিলিত-মিশ্রিত হয়ে গেছে। স্বর্গনরকাদির ভয় একদিকে এবং নিরপেক্ষ দর্শনরীতির উপস্থাপন তার পাশাপাশি বর্তমান। কোথাও সে স্ববিরোধিতা গোপন থাকে না, কিন্তু তা নিয়ে কোনো অসুবিধাও ঘটে না। মহতোমহীয়ান অণোরণীয়ানের কল্পনার সঙ্গে-সঙ্গে ভূতপ্রেত, পিশাচ, বেতালসিদ্ধি, অভিচার, ব্যভিচার সমর্থন এবং আরো কত কিছু ব্যাপার যে হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় বিরাজিত থাকে তা বুঝে ওঠার ক্ষমতা আমার সীমিত বুদ্ধিতে কুলোয় না। সব সময় সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও এই বিশাল ছত্রছায়ার তলে যাঁরা আছেন তাঁরা হিন্দু।

পূর্বে আমরা বলে এসেছি, হিন্দুধর্ম কথাটার উদ্ভাবনা এবং গ্রহণ ঠিক কবে হয়েছে, আমরা জানতে পারি না। ধরেই নিই যে বৈদিক যুগ, ঔপনিষদীয় যুগ, মহাকাব্যের যুগ—সব কিছু ব্যাপ্ত করে হিন্দুধর্ম আছে। কথাটা তো সর্বাংশে সত্য নয়। ওইসব যুগে হয়তো তথাকথিত হিন্দুধর্মের নিউক্লিয়স বা বীজাকার মাত্র ছিল—নামকরণও তখন হয় নি। ন্যূনাধিক মহাকাব্য রচনার কাল থেকে একটা সংগৃহীত এবং সুসম্বদ্ধ মতবাদ স্বীকৃত হল। এর মধ্যে মনে হয় মহাভারত-কাহিনী প্রাচীনতর—যদিও লিপিবদ্ধ হয় তৃতীয়-চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে। অপরদিকে, রামায়ণ-কাহিনীর বীজাকারও সুপ্রাচীন (জৈন রামায়ণ এবং হিট্টাইট-দের প্রাপ্ত কিছু পুঁথিতে নামগুলি আছে)। কিন্তু রামায়ণ সঙ্কলিত হয় ন্যূনাধিক দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিশ্বের প্রথম ভাষা-বৈজ্ঞানিক পাণিনি তাঁর "অষ্টাধ্যায়ী" রচনা করেন। তিনি কাবুলী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলা ঠিক। প্রাচীন যে ভাষার আধারে তা রচিত হল, তা ছিল উদীচী অথবা উত্তর-আফগানিস্তানের ভাষা। এই ভাষা হল সংস্কৃত বা পরিষ্কৃত শুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত ভাষা। ভাষা এবং মানবজীবন সচল বলে তা ক্রমাগত পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছিল। মিশ্র ভাষা আর মিশ্র-জনের উৎপত্তি রোধ করা যায় নি। সুতরাং প্রাকৃত ভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় রচনাও চলতে লাগল এবং মূল কাঠামোটি অবিকৃত রাখার প্রয়াস রইল সংস্কৃতে। তাতে পঠন-পাঠনের কাজ, ধর্মশাস্ত্র লেখার কাজ চলতে লাগল। অপরদিকে ছড়িয়ে-যাওয়া মানুষেরা পতিত বা ধর্মচ্যুত হলেও ব্রাত্যস্তোম বা একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করে তাদের আবার আর্যীকরণ করা হত। রামায়ণ মহাভারত লিপিবদ্ধ হয় সংস্কৃত ভাষায় সুপরিণত কোনো ব্রাহ্মী লিপিতে (যাকে তখন দেব-নাগরী বলা হয়ে থাকতে পারে)। মহাভারতের রীতিনীতি দেখে বোঝা যায়—তা প্রাচীন আর্যদের কথা ও কাহিনী। অপরদিকে রামায়ণ সুসংস্কৃত মূল্য-বোধ নীতিবোধ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমরা ভুল করব না, যদি মনে করি—এই দুটি মহাকাব্যকে আধারীভূত করে যে ধর্মনীতি প্রচলিত হল—তাকে হিন্দুধর্ম আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে 'হিন্দু'র ধর্ম গ্রহণ করল: (ক) বৈদিক বহুদেববাদ, (খ) ঔপনিষদীয় বেদবিরোধিতাকে একপ্রকার মসৃণতার আড়াল দিয়ে সৃষ্ট পরমেশবাদ বা একশক্তির উৎসমূল একাত্মবাদ। (ক) ও (খ) দুটির বিরোধিতাকে মিলিয়ে দেওয়া হল কৌশল করে। (গ) বহুদেববাদ সহযুক্ত হল শক্তি (স্ত্রীলিঙ্গ) বা দেবীকে স্বীকৃতি দেওয়া, দেবীর সংখ্যাও অনেক হল। সেসব দেবীর আগমন হল মহেনজোদারো-হরপ্পার দেবীদের নিয়ে; তুর্ক, মোঙ্গল, তাতারদের, দেবীদের নিয়ে (এঁরা অনেকেই তখন মহাযানী বৌদ্ধমতে ও বৌদ্ধতন্ত্রের গৃহীত)। গ্রামীণ সভ্যতার ধারক অস্ট্রো-এশীয়দের থেকে পাওয়া নানারকম দেবী যেমন দুর্গা, ওরাওঁদের চণ্ডী দক্ষিণের মনচাম্মা, বাস্থাইয়ের মুম্বাদেবী প্রভৃতি। বহুক্ষেত্রে স্বীকৃত দেবদেবীদের পরিণয় স্বীকৃত হল তৎকালীন মানবসমাজের আদর্শে। (ঘ) যুক্ত হল অস্ট্রো-এশীয়দের থেকে পাওয়া দেবতাসমূহ। এসব দেবতার মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, সর্প, ওষধিমূল থেকে শুরু করে সবরকম প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রকৃতিবাদের থেকে পাওয়া (ন্যাচারালিজম) দেবদেবী ও তদতিরিক্ত টোটেম, ট্যাবু থেকে পাওয়া দেবদেবীরাও গৃহীত হলেন। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড়ো স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। এ নৃগোষ্ঠী থেকে পাওয়া নানা তুকতাক পূজার উপাদান পাওয়া গেল। (ঙ) প্রত্ন-দ্রবিড়গোষ্ঠী দক্ষিণ-ভারতে ক্রমশ দ্রবিড় সভ্যতায় সুপরিণত হয়েছে। কিছু দেব-দেবী, মন্ত্র ও তন্ত্র সেখান থেকে সংগৃহীত হল। সেই সঙ্গে এইসকল গোষ্ঠীও মিলিত দেবযানের অনেকাংশ গ্রহণ করল। 'শ্রীপতি' (তিরুপতি) বা নারায়ণ, লক্ষ্মী বা শ্রীদেবী ভূমিদেবী, বিষ্ণু বা বিণহু (নীলদেব) কৃষ্ণ বা কিরুট্টিণ, বিনায়ক বা গণেশন (কানেচন), ব্যক্ত বা বিকট (ভেঙ্কট সুন্দর) দেবতা, যন্মুখম্ বা কার্তিক—

এগুলির সাম্যানীকরণ হল বিশাল হিন্দুদেবসমাজের মধ্যে। দুটি ভিন্নধর্মের দেবতার নামাঙ্কিত দেবতাও পাওয়া গেল, যেমন—রামেশ্বর বা রামস্বামী। রাম উত্তর-ভারতীয় মহাকাব্যের নায়ক—তিনি দক্ষিণে শিবপূজা করলেন বলে বলা হল তিনি রামেশ্বর বা রামস্বামী। দক্ষিণ এবং উত্তর অনেক দেবদেবীকেই গ্রহণ করলেন।

একটা বিশেষ কথা এখানে বলা দরকার যে, বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে পরবর্তী আর্যসন্তানগণ গিয়েছেন এবং সেখানে নিজের মতো করেই থেকেছেন। হিন্দু বর্ণাশ্রমীদের অতিরিক্ত কাঠিন্য আর পঞ্চম জাতি বা পারিয়া বা অচ্ছুত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই কারণেই একেবারে যোগাযোগ নিষিদ্ধ এবং অশাস্ত্রীয়। বলা বাহুল্য যে কুরান এবং হাদিশে যা প্রভেদ, হিন্দুধর্ম দর্শন আর হিন্দুশাস্ত্র ও তার ব্যাখ্যার মধ্যেও সেই প্রভেদ। সেটা যে কত তীব্র এবং তীক্ষ্ণ তা বোঝা যায় কয়েক দশক আগেমাত্র যখন ড. আম্বেদকর দু-হাজার অনুচরসহ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ প্রায়ই নিরামিষাশী হন এবং স্বীয় সমাজে সংরক্ষণবাদী হয়ে থাকার জন্য দেখা যায়। তাঁদের বর্ণ বেশির ভাগই গৌর আর্যত্বের অবশেষ। ব্যতিক্রম মিলবে পশ্চিম উপকূলের গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যে। তাঁরা আমিষাশী (হয়তো পূর্বদেশ থেকে গেছেন)। তাঁদের বিবাহাদিতেও মৎস্য অবশ্য একটা প্রয়োজনীয় উপাদান। আর কেরলে নাম্বুদ্রি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্যরকম নিয়ম দেখা যায়। তাঁদের সংকারের ব্যবস্থা থাকে স্বগৃহসংলগ্ন মুক্তস্থানে। জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানের বিবাহ স্বশ্রেণীতে হলেও বাকিরা বিবাহ করেন নায়ারগৃহে এবং মাতৃতন্ত্র অনুযায়ী প্রথায় পত্নীর পিতৃগৃহে বসবাস করে থাকেন। বলা হয়, আচার্য শঙ্কর এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

দ্রবিড় গোষ্ঠী বহুধা না হলেও মূলত চতুর্ধা। হিন্দুধর্মের মধ্যে তাঁদের প্রধান দান হল ভক্তিবাদ, পূজা-নিবেদন, আত্মসমর্পণসহ ফলমূল ইত্যাদির উৎসর্গ। এমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুঠাম শরীর, চিক্কণ কৃষ্ণাভ দেহবর্ণ, সুরুচি এবং বসন-ভূষণের শিল্প আর পারিপাট্য এ গোষ্ঠীসমাজের এক সুন্দর বিশিষ্টতা। পূজিত দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, শিব, কার্তিক, গণেশ, দেবী ভগবতী (আর্যিকা) প্রধানভাবে পূজ্য। এ ছাড়া আছে একপ্রকার তন্ত্রও। এটি দেবদেবীসমাগম থেকেও হতে পারে। আবার, স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য সকল স্থানের মতো এখানেও তন্ত্রমত উদ্ভাসিত এবং গৃহীত হয়ে থাকবে। সমগ্র দক্ষিণে এককালে প্রত্ন-আজীবিক ধর্ম আর বৌদ্ধ ধর্ম প্লাবিত হয়েছিল। দেখে বিস্ময় জাগে যে আজ সেখানে তথাকথিত জৈন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম লীনপ্রায় অবস্থাপ্রাপ্ত। কয়েকটি সুন্দর মূর্তি ও বৌদ্ধ স্তূপের মতো বিশাল গোপুরমসমন্বিত হিন্দু মন্দিরের অসাধারণ স্থপতিকলা মনোহরণ করে। বৌদ্ধ, জৈন গুহাগুলি, গুহাহিত শিল্প (অজন্তা, ইলোরা, মহাবলীপুরম) যারাই করে থাকুক, আজ তা হিন্দু ঐতিহ্যে বিলীন। অজন্তা চিত্রকলা এবং চীনা চিত্রকলার মধ্যে একসময় সপ্তম, অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে ভিক্ষু-শ্রমণদের যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। দক্ষিণে নীলগিরি অঞ্চলে বাইসন আছে—দুর্গা ভগবতীর সঙ্গে মহিষ বা মহিষাসুরবধের কাহিনী তা মনে পড়িয়ে দেয়। দক্ষিণী ব্রাহ্মণের বেদপাঠের ঐতিহ্য এখনও শুদ্ধ (অবশ্য তার মূর্ধণ্যীভবন ঘটেছে)।

(শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

CHART 4

Rise And Development of Indian Thought Systems in Ancient, Medieval And Modern Phases (4500 B. C.—1947 A. D.) roughly covered.

4500—1500 B. C.

(a) Proto-Dravidic Mohenjodaro-Harappa Civilisation in Norh-West India, and (b) Austric Culture in Eastern, South-Eastern and Middle India, and (c Mongoloid settlements all along the length of the Himalayas. Each had distinctive culture and religion and they were inter-related in all probability.

1500 B. C.—700 B. C.

Coming of the Aryans (branched off from Indo-Iranians) speaking Indo-European language and settling down all over the North-Western India. They were pastoral people when they came into contact with urban civilisation of Mohenjodaro-Harappa and rural culture of the Austric peoples. They adopted some aspects of culture and religion of these two peoples and also of the Kiratas of the Himalayas. They had Vedic orthodoxy and developed Varnasrama later.

1000 B. C.

Mahabharatam War—a battle of antithesis and synthesis (contemporaneous with the ruling period of Soloman and David in middle east at present.)

700—200 B. C.

Challenge of Vedic orthodoxy and Varnasrama by (a) Upanisadic thoughts, (b) Buddhism (600 B. C.—1000 A. D. later), (c) Proto-Ajivikism and Jainism and the different sects of Antivedic popular wandering sects, (d) Free thinking and nonconformism : the Carvakas and Atheism.

200 B. C.—400 A. D.

(a) Panini the Grammarian; Ayurveda, (b) compilation of Ramayana (200 B.C. ?) and that of Mahabharata (300 A.D. ?). (c) Dharmashastras. (d) Theistc systems of Philosophy (Nyaya-Vais'esika Sāmkhya-yoga, Purva-Mimansā & Vedanta). (e) Germination of *Hinduism* in the form of theistic philosophy, in the synthetic spirit of Gita in an all absorbing attitude covering Veda and Upanisads and the Epics. The date of Hinduism as a departure from Aryanism is rather unknown. The Sutras. Puranas. (f) Contact of Greek-Hellenic thoughts (320 B. C. on).

400 A. D.—800 A. D.

Rise and development of Hinduism—(a) Pancopasanā. (b) Synthesis of Vedic Pantheon and later deities. (c) Indigenous deities collected from various peoples due to a broad basis of cultural conflict and synthesis. (d) Various ideas like incarnation, rebirth and karma were adopted by Hinduism which became the state

religion with the Guptas, the Palas and the Senas in Bengal ; Tantra.

800 A. D.—1300 A. D.

Coming of Islam : conquest of Islam by means of (a) Sufism or love and (b) power or force. A picture of continuous conflict and synthesis went on amongst the rulers & the ruled, the Muslim and the Hindus and the picture continued until the conquest of South India (Devagiri was conquered by Malik Kafur).

1300 A. D.—1800 A. D.

Consolidation of Islam—Deepening of Muslim Hindu contact by means of (a) Sufism, (b) Liberal attitudes held by Nasiruddin, Akbar, and Dara Shikoh, (c) Synthetic religion of Din E-lahi and saints of North India, (d) coming of Europeans.

1800 A. D.—1947

Birth of Neo-Hinduism—growth of inner crisis in all the fields (a) political, cultural and religious, (b) Synthesis to be found in Rammohan, Tagore, Vivekananda and other aspects of Islam and Christianity. Syncretism.

বদরুদ্দীন উমরের দুটি বই

কমলেন্দু ধর

'এই ভূখণ্ডের ভূম্যাদি অতিশয়···উর্বরা, মনুষ্যদিগের আহার ব্যবহার এবং সুখের নিমিত্ত যে বস্তুর প্রয়োজন করে তাবৎ প্রচুর পরিমাণে এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।' ২৫.৭.১২৬০ বঙ্গাব্দে "সংবাদ প্রভাকর"-এর সম্পাদকীয় সূচনার কয়েকটি লাইন। এরপর পৃথিবীর মানচিত্র অনেক বদলে গেছে। যেমন বাঙলাদেশের মানচিত্রও। ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ এখন ১৯৯১। এর আগে শতাব্দী জুড়ে উপমহাদেশে ইংরেজরা যে ভূমিকায় ছিল, ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানের ভূমিকাও অনেকটাই তাই। ১৯৭১-এ 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক' বাংলাদেশে জন্ম নিল 'গণতান্ত্রিক স্বদেশী লুঠেরারা'। এবং অবশ্যই তার মুখ্য চালিকা-শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ আর বহুজাতিক সংস্থাগুলি। গত কুড়ি বছর (১৯৭১-৯০) ধরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহ যে নানান চড়াই-উতরাইয়ের পথ ধরে এগিয়েছে পিছিয়েছে তার নিপুণ আলোকপাত রয়েছে বদরুদ্দীন উমরের ১৯৯০-এ প্রকাশিত "পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা" গ্রন্থটিতে। পাঠকরা সামগ্রিক-ভাবে আজকের বাংলাদেশের অবস্থা আর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা, তা সংক্ষিপ্ত হলেও, এ গ্রন্থটি থেকে পাবেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে একদিকে যেমন সামরিক শাসন চলেছে, তেমনি 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন'ও হয়েছে, গঠিত হয়েছে 'গণতান্ত্রিক সরকার'ও। এক শাসকের বদলে আরেক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে—এবং তা ভোটের মাধ্যমেও হয়েছে। কিন্তু ভোট দিতে পারাই কি গণতান্ত্রিক সাফল্যের মাপকাঠি? একটি দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কতটা জরুরি এবং প্রয়োজনীয়, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ খুব বেশি নেই। কিন্তু এ-সমস্ত স্বাধিকারগুলিকে অস্বীকার করে, মৌখিকভাবে স্বীকার করে নিলেও, একমাত্র ভোটদানের ক্ষমতাকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের মুখ্য বিষয় করে তোলা হয়েছে। ফলত, ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গঠিত হলেও সেখানে জন-মানসের চিন্তা-ভাবনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে বা আগামী দিনেও হবে—তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। "পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা" প্রথম প্রবন্ধটিতে তার জটিল সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে সহজ সাবলীল নিপুণতায় বদরুদ্দীন উমর তুলে ধরতে পেরেছেন। যেহেতু বাংলাদেশ পৃথিবীর পশ্চাৎপদ দেশগুলির শিখরে অবস্থান করছে, সঠিকভাবেই লেখক তাঁর বিশ্লেষণের পটভূমিতে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সমস্যাগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বাধিকার ছাড়া শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কেন কী কারণে গণতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্য আসতে পারে না, তার সরল সত্যগুলি লেখক পরবর্তী চারটি প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। যেমন 'পাকিস্তানে "গণতন্ত্রের বিজয়" প্রসঙ্গে' আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন :

এদিকে পি. পি. পি. এবং তার নেত্রী বেনজীর ভুট্টো যত বড়ই গণতন্ত্রী ও জনগণের স্বার্থের

পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা—বদরুদ্দীন উমর। প্রতীক, ঢাকা। পৃ ৮৭+৮৮। ১৯৯০। আটচল্লিশ টাকা।
বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব—বদরুদ্দীন উমর। প্রতীক, ঢাকা। পৃ ২৫+৮। ১৯৯০। বাহান্ন টাকা।

প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দান করুন, তাঁরাও মূলত এমন সব স্বার্থের প্রতিনিধি যার সঙ্গে সামরিক শাসন-স্বার্থের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়টি বেনজীর প্রধানমন্ত্রিত্বে আসীন হওয়ার পর থেকে যেসব নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছেন তার দিকে লক্ষ্য রাখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে (পৃ ১০)। একই কথার পুনরাবৃত্তি আমরা পাই 'বাংলাদেশে "নিরপেক্ষ" নির্বাচন প্রসঙ্গে' লেখাটিতে। যেখানে তিনি লিখছেন—এ কথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তানের উপরোক্ত নির্বাচন মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ অর্থাৎ বড়ো ধরনের কোন কারচুপি না করেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যি অর্থে কোন গণতান্ত্রিক লক্ষ্য পাকিস্তানে অর্জিত হয়েছে (পৃ ১৯)।

'জঙ্গী আন্দোলন : পশ্চাদপদ চেতনা', 'বাংলাদেশে "নিরপেক্ষ" নির্বাচন প্রসঙ্গে', 'বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্র'—প্রবন্ধ তিনটিতে এই বিষয়গুলি লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মেধাবী বিশ্লেষণের পর এই সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের আলাদা-আলাদা সমস্যাগুলি পর্যায়ক্রমিক বর্গীকরণের সাহায্যে বাংলাদেশের চলমান জনজীবনের মৌলিক প্রবাহগুলিকে আলোকিত করেছেন। এখানে দেশজ শাসক আর তার বিদেশী সহযোগীদের দ্বৈরথ শানিত ঘৃণ্য আক্রমণ একের পর এক কীভাবে জনজীবনের প্রতিটি স্তরে নেমে আসে, তার তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় আমরা পাই "শ্রমিকশ্রেণীর উপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের নোতুন হামলার প্রস্তুতি"; "স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অফিসের নতুন সময়সূচী"; "লুণ্ঠনকারীদের সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি" প্রবন্ধগুলিতে। এই যৌথ আক্রমণের সহায়ক শক্তি হিসাবে সমস্ত প্রচারমাধ্যমে এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাকে তারা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ আর ব্যবহার করে চলেছে তা "সাপ্তাহিক বিক্রম"-এর সাক্ষাৎকারে বদরুদ্দীন উমর আরো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন।

এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল "ছাত্র-সমাজ ও ছাত্র আন্দোলন" নিয়ে। এবং প্রাসঙ্গিকভাবেই পরবর্তী প্রবন্ধে তারই অনুষঙ্গে আলোচিত হয়েছে "পরীক্ষাকেন্দ্রে নৈরাজ্য কেন?" এখানে সমগ্র সমাজে বিদ্যমান এক চরম নৈরাজ্যের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার সার্বিক ভ্রান্তিগুলি—তা পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে শিক্ষার মান, শিক্ষকদের দক্ষতা আর দায়িত্বশীলতা, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং ফারাক, মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র সমস্যা, শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ক্রমপ্রসারিত অসন্তোষ ও ছাত্রসমাজের নকলপ্রবণতা একজন তীক্ষ্ণধী সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রচলন করলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না তাও লেখকের মননশীল বিশ্লেষণে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। পরিশেষে এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষা-শেষে ছাত্র-সমাজের কর্মসংস্থাপনের সমস্যাটি। এ সমস্যাগুলির কার্যকারণের আন্তর সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করে লেখক সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন যে একটি অনুন্নত পশ্চাৎপদ গণতান্ত্রিক দেশে কেন এই সমস্যাগুলি সব সময়ই বিদ্যমান থাকবে। এর কারণ দেশের যে সম্পদটুকু আছে তাও 'ভোটে নির্বাচিত কোনো সরকারও' পরিকল্পিতভাব জনগণের প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করেন না এবং করতে পারেন না। এখানে তাঁরা নিজেদের আখের গোছাতে যতটা ব্যস্ত ততটাই সহৃদয় বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে স্বদেশের সম্পদ লুঠের উন্মুক্ত মৃগয়াভূমি হিসাবে ছেড়ে দিতে। "হরিপুর তৈলক্ষেত্র লীজ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন" প্রবন্ধে বদরুদ্দীন উমর বলিষ্ঠভাবে এ তথ্যটি তুলে ধরেছেন। লেখকের ভাষাতেই বলা যাক—'বাংলাদেশ সরকার এই তৈলক্ষেত্রটি এমন শর্তে লীজ দিয়েছে যা দেশীয় স্বার্থের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর এবং আমাদের দেশের সম্পদ সাম্রাজ্যবাদীদেরকে লুটপাট করে নিয়ে যাওয়ার উদার অনুমতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশ সরকারের যা চরিত্র তাতে এ ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এভাবেই তারা দেশের শাসন-কাজ পরিচালনা করে থাকে, দেশের সম্পদ নিয়ে এভাবেই ছিনিমিনি খেলতে তারা অভ্যস্ত।'

"পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা" গ্রন্থটিতে রয়েছে ষোলোটি প্রবন্ধ এবং একটি সাক্ষাৎকার। আর "বিপ্লব প্রতিবিপ্লব" গ্রন্থে রয়েছে বারোটি প্রবন্ধ আর দুটি সাক্ষাৎকার। দুটি বাদে সব লেখাই লেখক লিখেছেন ১৯৮৯ এ। লেখাগুলি আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। তারই সংকলিত গ্রন্থরূপ এখানে আমরা পেয়েছি।

বিপ্লব সমাজের রূপান্তর আনে, মানুষের সার্বিক সুস্থ বিকাশের পথগুলিকে উন্মুক্ত করে দেয়। আর প্রতিবিপ্লবের কাজ ঠিক এর উলটো। আজ দুনিয়া জুড়ে এই উলটো পথের নায়কদের সংখ্যাই বেশি—আলবেনিয়া বাদে, লেখকের মতে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন-স্খলনের উদাহরণগুলি আজ প্রতিবিপ্লবীদের হাতেই বেশি। সংগত কারণেই তাদের উল্লাস আর আস্ফালন ক্রমাগত বাড়ছে। তাই মানুষ, বিশেষ করে শোষিত মেহনতি গরিষ্ঠ মানুষও, আজ সংশয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং নানান জিজ্ঞাসায় আবর্তিত। মানুষের জিজ্ঞাসা সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে, তাদের সংশয় মার্কসবাদের সত্যাসত্য নিয়ে।

"বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব" গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধে লেখক এই ভবিষ্যৎ আর সত্যাসত্য প্রসঙ্গে নানান জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এবং আজ সেখানে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ নিয়ে জিজ্ঞাসাগুলি অধিকাংশই নেতিমূলক, সেখানে লেখক যথেষ্ট সচেতনভাবেই মার্কসবাদের সপক্ষে আর সমাজতন্ত্রের নিশ্চিত অগ্রগতির কথা নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশ করেছেন। মুখবন্ধেই বদরুদ্দীন উমর তাঁর বিশ্বাসের কথা সোজাসুজিভাবে বলে নিয়েছেন। তিনি লিখছেন—'বিশ্ব পরিসরে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা কোন শক্তির পক্ষেই কোন দেশে এবং বিশ্ব পরিসরে সম্ভব নয়।' লেখকের বই বিশ্বাসের সাথে আশ্বাসের কথাও আমরা পাই : "মাও সেতুঙ-এর ঐতিহাসিক অবদান ও তাঁর শিক্ষার বর্তমান গুরুত্ব" নামক দু পৃষ্ঠার লেখাটিতে। এখানে তিনি বলছেন—'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অপরাজেয় ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্পর্কে জনগণের মনে হতাশার পরিবর্তে আশার সঞ্চার করা, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবধারিত ধ্বংসের ঐতিহাসিক কারণগুলি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা' এবং পরিশেষে নিঃসংশয় বিজয় অর্জন করা।

যুক্তি আর তথ্যের ভিতর দিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে একদিকে যেমন সোভিয়েত, চীন ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান অবস্থানকে তুলে ধরেছেন তেমনি মার্কস, লেনিন, মাও এবং বিশেষ করে স্তালিনের তত্ত্ব ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাসূত্রগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্রের বর্তমান পতন আর সংকটের জন্য লেখক সরাসরি ক্রুশ্চেভ থেকে গরবাচেভ আর তেং শিয়ং পিং গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন। এখানে লেখকের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট যে এই সংকট বা স্খলনের জন্য উক্ত নেতৃবৃন্দের মার্কসীয় তত্ত্বের ভুল প্রয়োগই একমাত্র কারণ। এই বক্তব্যের পৌনঃপুনিক উদাহরণ আমরা পাই লেখকের "স্টালিন ও বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন", "বিশ্ব প্রতিবিপ্লবের দ্বিতীয় কেন্দ্র", "বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চা প্রসঙ্গে", "খোলা হাওয়ার মাহাত্ম্য" লেখাগুলিতে। এখানে বিশেষ উল্লেখ করার মতো বিষয় হল স্তালিন এবং তাঁর অনুসৃত নীতি। লেখা স্তালিনের বিরুদ্ধে পুরনো আর নতুন-করে-ওঠা বিতর্কের সূত্রে কেন আজও স্তালিনের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম, তা বলেছেন। তবে উল্লিখিত শেষ দুটি লেখক ব্যক্তিগত চাপান-উতোরের স্তর থেকে স্তালিন-মূল্যায়নে নতুন কোনো মাত্রা যোগ করে না। একটি লেখা বদরুদ্দীনের লেখার সমালোচনার পালটা

সমালোচনা। দ্বিতীয়টি "সংস্কৃতি"র বিশেষ স্তালিন সংখ্যার সমালোচনার জবাব।

অন্য কয়েকটি প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সংকট আর পতনের প্রেক্ষিতে লেখক "সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নগ্ন রূপ" প্রকাশ করেছেন বা "কে জি বি সি আইন আঁতাতের গণতন্ত্র"-এর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন অথবা "বর্তমান রাশিয়া ও চীনে পুঁজিবাদের সংকট" প্রবন্ধে নিঃসংশয় হয়ে লিখেছেন—'রাশিয়া ও চীনে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পূর্ণ হবার পর' (পৃ ৪৯) সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

এই গ্রন্থে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল "ঢাকা কুরিয়ার"-এ দেওয়া বদরুদ্দীন উমরের সাক্ষাৎকারটি। এখানে লেখক বাংলাদেশে NGO-র বিস্তৃতি, ভূমিকা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি স্পষ্ট ধারণা পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন। NGO-র ভূমিকা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী ভয়াবহ আকার নিয়েছে তা পাঠকদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি "বাংলাদেশে গণজাগরণের প্রস্তুতি চলছে" শিরোনামে লেখকের কিছু আশাবাদের কথা উচ্চারিত হয়েছে।

বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতি সংক্রান্ত আর-একটি বই

বইয়ের নামকরণেই লেখক একটি নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করেছেন: ১৯৪৮-৮৯। কারণ তার মাত্র কয়েক মাস আগে বিশ্বমানচিত্রে পাকিস্তানের জন্ম এবং এর ২৩ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। কিন্তু বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো এবং আদর্শগত দ্বন্দ্বের সূত্রগুলির অনেক কিছুই খুঁজতে হবে ১৯৪৮ বা ১৯৪৭-এর আগে। লেখক সংগত কারণেই প্রথম অধ্যায়ে এ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং সুচিন্তিতভাবে বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারার ভ্রূণরেখাটি তুলে ধরেছেন। পাঠক এই আলোচনার সূত্র ধরে একটি সর্বার্থে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে কোন্ প্রক্রিয়ায় বামপন্থী রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে ও তার কর্মধারা শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে দেয়, সে সম্বন্ধে আভাস সহজ সুন্দরভাবে পেয়ে যাবেন। এখানে লেখকের প্রধান কৃতিত্ব হল সংক্ষিপ্ত অথচ সুসংগঠিত এই রূপরেখাটি তিনি পরবর্তী অধ্যায়গুলি আলোচনার পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন।

এ ছাড়া স্বাধীনতাপূর্ব এ উপমহাদেশে এবং পরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তানে বা স্বাধীন বাংলাদেশেও যে বামপন্থী দল বলতে শুধু কমিউনিস্টদের বোঝায় না, তাও তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। যেমন মওলানা ভাসানী সম্পর্কে তিনি লিখছেন—'মওলানা ভাসানী কমিউনিস্টদের তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে পড়াশুনা কিংবা চর্চা করেন নি ঠিকই,…এভাবে মার্কসবাদী তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত না থাকলেও…তাঁকে একটি আদর্শ বামপন্থী নেতৃত্বে পরিণত করে তুলেছিল' (পৃ ৩০)।

এখানে যে তথ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বহন করেই সমাজবাদী অংশের ভাঙনের প্রক্রিয়ায় এ উপমহাদেশে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকী কমিউনিস্ট পার্টিও। আর পরবর্তী কালে এক থেকে একাধিক কমিউনিস্ট পার্টিও একই ভাঙনের প্রক্রিয়ায় এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই কমবেশি ধারক-বাহক। আলোচ্য বইটিতে লেখক এই বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের ক্রমিক ধারাটি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পার্টির দলিলে, প্রকাশিত পুস্তিকা, অন্যান্য নেতৃবর্গের লিখিত পুস্তক থেকে তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। এর সাথে এই দলগুলির বিভিন্ন সময়ের ঐক্যপ্রয়াসও লেখকের আলোচনাতে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে।

বামপন্থী দলগুলির, বিশেষ করে লেখকের আলোচিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির, ভগ্নাংশে ভাঙনের প্রক্রিয়া আর ঐক্যপ্রয়াসের পরিণতিতে যে তথ্যটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তা হল: এ উপমহাদেশে নামে কমিউনিস্ট পার্টি, এক থেকে একাধিক, গঠিত হলেও কখনোই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তত্ত্ব আর বাস্তবের সঠিক প্রয়োগে একটি বৈপ্লবিক কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে ওঠে নি। তাই আজ পর্যন্ত যতগুলি কমিউনিস্ট পার্টি এ উপমহাদেশে গড়ে উঠেছে তারা বামপন্থী রাজনৈতিক দল হিসাবে অবশ্যই স্বীকৃতি পেয়েছে; তবে এ বামপন্থীরা সংস্কার করে মাত্র, কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে না।

জগলুল আলম পরের আটটি অধ্যায়ে ১৯৪৮ থেকে বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির জন্মলগ্ন থেকে তাদের কর্মধারা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। লেখকের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল—এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেও তিনি পুরোপুরি তথ্যনিষ্ঠ থেকেছেন। এবং আরো প্রশংসার বিষয় হল—লেখক নিজের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শগত পথকে তুলে ধরতে পেরেছেন। এমনকী ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করতে গিয়েও তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করায় গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে এখানে লেখক বামপন্থী রাজনৈতিক দল বলতে মূলত কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন ভগ্নাংশকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। যদিও তিনি "পূর্বকথন" অংশের চতুর্থ পাতায় বলেই নিয়েছেন—'ছোট বড় মিলিয়ে দেশে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় ৪৮টি। এদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫টি দল সাংগঠনিক অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। বাকি দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি বর্তমানে প্রায় অস্তিত্ববিহীন এবং অন্যগুলো প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন নিয়ে কাজ করছে না। আমাদের আলোচনা মূলত সীমাবদ্ধ থাকবে প্রথমোক্ত ২৫টি রাজনৈতিক দলের ওপর।' এ দলগুলি সবকটিই প্রায় ওই কমিউনিস্ট পার্টির ভগ্নাংশ।

লেখক অধ্যায়গুলির বিভাজন করেছেন এভাবে: উপমহাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত / পূর্ব পাকিস্তানে বামপন্থী আন্দোলন / কমিউনিস্ট শিবিরে ভাঙন / পূর্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলন / স্বাধীনতা-যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা / মুজিব আমলে বামপন্থী রাজনীতি / জাসদ ও সর্বহারা পার্টির রাজনীতি / জিয়ার আমলে বামপন্থী রাজনীতি / ঐক্য না বিভক্তি।

'সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো প্রাথমিকভাবে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, কারণ আগে এসমস্ত পার্টি ও সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মূলত হিন্দুরা। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ হিন্দু নেতা ভারতে থেকে যাওয়ায় কিংবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়ায় এতদঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যায়। স্বাধীনতার আগে যেখানে পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার, সেখানে পাঁচের দশকে এতদঞ্চলে কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন মাত্র কয়েক শত' (পৃ ২৬)।…এভাবে পাকিস্তানের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মলাভ করে পাকিস্তানের বাইরে ভারতের কলকাতায় (পৃ ১৭)।

এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায় আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের মার্কসবাদে শিক্ষিত করে তোলা। অবশ্য এর পরেও অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কাজ করার প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অন্ত ছিল না (পৃ ২২)। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সদস্যও আওয়ামী লীগের লেজুরবৃত্তি শুরু করেন (পৃ ২৪)। কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত ৩১ জন কমিউনিস্ট নেতার মধ্যে মাত্র চার-

বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮—৮৯—জগলুল আলম। প্রতীক, ১৯৯০। পৃষ্ঠা ১১৪+১২। পঁয়ষট্টি টাকা।

জন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বাকি সবাই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির থিসিস অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ বিপ্লবী তত্ত্বের পক্ষে রায় দেন (পৃ ২৬)। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরা ছিলেন এক ধরনের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির শিকার। পারিপার্শ্বিক বা বাস্তব বিবেচনা না করে এবং জাতীয় ঘটনাবলীকে ইস্যু হিসাবে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁরা সামগ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিবেচনা করেছিলেন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এমনকী আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীতে উত্থান-পতনের ফলে পার্টির নেতা-কর্মীদের একাংশ মাঝে-মধ্যে বাস্তবসম্মত সূত্র ও প্রস্তাব উত্থাপন করলেও আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে প্রায়ই সেগুলো বানচাল করে দেওয়া হচ্ছিল (পৃ ২৬)। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে লেখকের বয়ানেই তথ্যগুলো তুলে ধরা হল। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম থেকেই আমরা বাস্তবের উপকরণগুলি পেয়ে যাই : অর্থাৎ কমিউনিস্ট শিবিরে ভাঙন। এই ভাঙনের ফল হল—একদা পূর্ব-পাকিস্তানে এখন বাংলাদেশে বামপন্থী দলের সংখ্যা ৪৮। এবং ক্রমশ ভগ্নাংশে-পরিণত-হওয়া এই বামপন্থী দলগুলির প্রধান কর্মসূচি হল কে কত বড়ো বামপন্থী তা জাহির করার কলাকৌশল প্রদর্শন করা। যেমন, আওয়ামী লীগ বা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে বলা যায়। আওয়ামী লীগ ভেঙে ১৯৭২, ৩১ অক্টোবর জাসদের আত্মপ্রকাশ। ১৯৭২, ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশে ফিরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আসনে বসেন। ১৯৭২, ১০ জানুয়ারি থেকে ৩১ অক্টোবর—মাত্র দশ মাস সময়। কোনো শাসকের সাফল্য বা ব্যর্থতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়টা খুবই অল্প। কিন্তু জাসদ তখন সঠিকভাবে শাসকশ্রেণীর মূল্যায়ন করতে পেরেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—'মুজিব সরকার দেশের অরাজক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে' (পৃ ৮৪)। এ ছাড়া জাসদ ঘোষণা করতে পেরেছিল আওয়ামী লীগ তথা মুজিবের সাথে সমাজতন্ত্রের আর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই জাসদের প্রয়োজন কেন বলতে গিয়ে তাঁরা লিখছেন : 'শ্রেণীদ্বন্দ্ব অবসানের জন্য, শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশগত কারণে সহায়ক শক্তি হিসাবে রাজনৈতিক সংগঠনের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন তা উপলব্ধি করেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জন্মলাভ করেছে এবং তা দেশের লাখ-লাখ মানুষের অনুমোদন লাভ করতে পেরেছে' (পৃ ৮৫)। ঠিক এজাতীয় ঘোষণা বা সংকল্প নিয়েই, শব্দের কম-বেশি কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, বামপন্থী দলের অভ্যুদয় হয় যে-কোনো দেশে। আর কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজনীয়তাও তো এ কারণেই।

দেখা গেল, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে জাসদ দেশের একটি 'বৃহত্তর' বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আর একদা বামপন্থী তথা সমাজতন্ত্রী মুজিব স্বয়ং তথা আওয়ামী লীগ জাসদকে 'স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়নের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে' (পৃ ৮৭)। মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭৩ এর নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, দৈনিক পত্রিকার অফিস গায়ের জোরে দখল, পত্রিকা-সম্পাদককে জেলে পাঠান, জনসভায় দাঁড়িয়ে মুজিবের সর্বহারা পার্টি-কর্মীদের প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ, এবং তা কার্যকর করা। সিরাজ সিকদারকে পুলিশ হত্যা করে। সেভাবে আরো শয়ে-শয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়। সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫, ২ অথবা ৩ জানুয়ারি। ইতিহাসের পরিহাস, এর মাত্র সাত মাস পরে ১৫ অগস্ট রাতে মুজিবকেও পরিবার-পরিজন-সহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে ও রাজনীতির সামগ্রিক ধারা পালটে যায়' (পৃ ৯১)।

জগলুল আলমের দেওয়া তথ্য আর বাস্তবের মেলবন্ধনেই প্রমাণ হয়ে যায় সংখ্যায় বামপন্থী বা কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যা বাড়লেও দেশের বৃহত্তম সাধারণ মানুষের চেতনার স্তরে তারা কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে না। কোথাও-কোথাও কিছু সংস্কারের প্রলেপ তারা দিতে পারে, কিন্তু কোনো মৌলিক পরিবর্তন তাদের পক্ষে আনা সম্ভব নয়। কারণ যারা নিজেরাই তত্ত্ব আর বাস্তবের প্রয়োগে সার্বিক চিন্তাচেতনার দৈন্যে আক্রান্ত, তারা কী করে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনবে? এবং ৪৮টির মধ্যে যে ২৫টি সংগঠনের কমবেশি তথ্য লেখক এখানে তুলে ধরেছেন, তা থেকেই এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়।

ঐক্য না বিভক্তি? শেষ অধ্যায়ে এসে লেখকের কাছে এটাই বড়ো প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটা বড়ো প্রশ্ন নয়। কারণ এক থেকে একাধিকবার ঐক্য আবার বিভক্তি—এরও তো তথ্যপ্রমাণ বিভিন্ন পার্টির অভ্যুদয় আর বিলীন হয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে লেখক বারবার তুলে ধরেছেন। তাতে দেশের বা দশের তথা বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের কোনো উপকার হয়েছে কি? তাই এখানে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল কেন ঐক্য? কিসের জন্য ঐক্য?

ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ-সিদ্ধির ঐক্য? না, সংস্কার করার জন্য ঐক্য? না, মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য ঐক্য?

সঠিক পার্টি থাকলেই কি সফল বিপ্লব সম্ভব?

বেণু গুহঠাকুরতা

"ভারতবর্ষ-পাকিস্তান পর্বে ছিল না—বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নাই"—প্রতিপাদক এম. আর. চৌধুরী। প্রথম আন্তর্জাতিকের কাল থেকে হাল আমলের বাংলাদেশের ঘটনাবলী ৮৪টি পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থ ঘেঁটে অসংখ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে লেখক তাঁর বক্তব্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই উপমহাদেশে কোনোদিন কোনো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

এখানে প্রশ্ন হল : তাহলে গত সত্তর বছর ধরে এদেশে যাঁরা মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলে এলেন, এঁরা কোথা থেকে এলেন আর গেলেনই বা কোথায়? বিশের দশকে যে মানুষগুলো নতুন বিশ্বদর্শনের খোঁজে ইংরাজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হিমালয় ডিঙিয়ে রুশদেশে গিয়েছিলেন বা যাঁরা সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে নানা পথ অতিক্রম করে বিপ্লবের তীর্থভূমিতে হাজির হয়েছিলেন, এম. আর. চৌধুরীর মতে এঁরা কেউই সৎ বিপ্লবী ছিলেন না। ফাঁসি অথবা এদেশে যাঁরা ইংরাজের লাঠি, গুলি, জেল উপেক্ষা করে সঠিক অথবা বেঠিক ভাবে কমিউনিস্ট মতবাদকে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এঁদের শ্রমিকশ্রেণী অথবা বিপ্লবের প্রতি কোনো ভালোবাসা ছিল না। আসলে এঁরা সবাই ছিলেন বিপ্লববিরোধী—উদ্দেশ্য ছিল 'কমিউনিজমের নামে শ্রমজীবী মানুষের মঞ্চটাকে সুকৌশলে' দখল করে রাখা। এম. এন. রায় থেকে খোকা রায় আর মহম্মদ শরীফ থেকে মুজফ্‌ফর আহমদ, আদুবল হালিম 'কেউই মার্কসবাদ নিয়ে মাথা ঘামান নি—কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠন এঁদের আদর্শ বা উদ্দেশ্য ছিল না। এঁরা মধ্যশ্রেণীর অবস্থানটা সুদৃঢ় রাখার আদর্শ হিসাবেই কমিউনিজমের নামে শ্রমজীবী শ্রেণীর মঞ্চটাকে সুকৌশলে দখলে রেখেছিলেন যাতে করে শ্রমজীবী শ্রেণী তার নিজস্ব পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা থেকে

ভারতবর্ষ-পাকিস্তান পর্বে ছিল না—বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নাই—এম. আর. চৌধুরী। ডলফিন এন্টারপ্রাইজ, ৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০১। ষাট টাকা।

বিরত থাকতে বাধ্য হয় এবং বাধ্য থাকে ঐ মধ্যশ্রেণীর কমিউনিস্ট বলে দাবীদারদের লেজুড়বৃত্তি করতে' (পৃ ৫৫)।

শুধু তাই নয়, 'আর একটু মনোযোগ দিয়ে যদি বর্তমান পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি' বলে দাবীদার "পার্টি" বা "পার্টিগুলির" উৎপত্তি ও নেতৃত্বের দিকে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এই গঠনবিন্যাস ও গঠনপ্রক্রিয়ায় একটি পরিবর্তনও আজ পর্যন্ত ঘটে নি। আর এই কারণেই সংগ্রাম তাই মধ্যবিত্তের স্বার্থবোধেই অনুপ্রাণিত। মধ্যবিত্তরা বিপ্লব করে না। এরা (সাধারণত) শ্রমিকশ্রেণীর আত্মসচেতন পার্টি গড়ে না। মধ্যবিত্তরা শ্রেণীস্বার্থে এবং ব্যক্তিগত অহঙ্কার থেকে অনেক সময় শ্রমিকশ্রেণীর মঞ্চটাকেই দখল করে রাখে। ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলে দাবীদাররা বিশেষ করে ধর্মনিষ্ঠ, সন্ত্রাসবাদী আর জাতীয়তাবাদী 'কমিউনিস্টরা' সেভাবে ঐ মঞ্চটাকে মধ্যবিত্তদের মঞ্চে পরিণত করে রেখেছিলেন এবং রেখেছেনও' (পৃ ৮১)।

মধ্যশ্রেণী বলতে যদি এম. আর. চৌধুরী প্রচলিত অর্থে পাতিবুর্জোয়াদের মনে করে থাকেন তাহলে মনে হয় তিনি ব্যাপারটার খুব বেশি সরলীকরণ করে ফেলেছেন। পাতিবুর্জোয়ারা ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই এমনকী শ্রেণীগতভাবেও বিপ্লবী আন্দোলনের সফল শরিক হতে পারেন একথা তো তিনি নিজেই তাঁর বইতে স্তালিনের প্রাচ্যের শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ১৯২৫ সালে দেওয়া বক্তৃতা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। স্তালিন তাঁর বক্তৃতায় দেখিয়েছেন 'এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী জোটের পাশাপাশি অন্য একটি জোটও গড়ে উঠেছে—শ্রমিকশ্রেণীর ও বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর জোট। এই জোট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি' (পৃ ৮২)। স্তালিনের শব্দচয়ন লক্ষ করবার মতো: শুধু শ্রমিকশ্রেণী নয়—সঙ্গে বিপ্লবী বুর্জোয়া-শ্রেণী এবং এদের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি—যারা মাঝপথে পালিয়ে যাবে না।

ব্যক্তিগতভাবে মধ্যশ্রেণীর লোকেরা তো বটেই, এমনকী জমিদারকুলোদ্ভবরা বিপ্লবী হতে পারে—ইতিহাসে এমন ঘটনার কথা তো অজানা নয়। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন—এঁদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল; ধরে নিলাম এঁরা মহাপুরুষ, এঁদের শ্রেণী-বিচার করা সঙ্গত নয়।

রুশদেশে ১৮২৫ সালে যাঁরা প্রথম "মহামান্য" জারের শক্তিকে অস্ত্র-হাতে চ্যালেনজ করেছিলেন ১৪ ডিসেম্বর সেন্ট পিটার্সবার্গে, তাঁরা কেউই শ্রমিক বা বুর্জোয়া ছিলেন না। সবাই ছিলেন জারের সৈন্য-বাহিনীর অফিসার, সকলেই ছিলেন ভূস্বামী-শ্রেণীর। অনেকেই বুঝতে পারেন নি—এঁরা কেন জারের শাসনকে খতম করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। 'In France, cobblers and ragmen wanted to became counts and princes, here it is the counts and princes who wanted to become cobblers and rag-men.'—ঠাট্টা করে বলেছিলেন মস্কোর তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল Fyodor Rotopchin (*First Breath of Freedom*, Vladmir Fyodorov, Progress Publishers, Moscow, 1987, p. 22)

এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা পাভেল পেস্তেল যিনি জারের ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছিলেন, তিনি এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন; কারণ 'The slavery of the peasants had always affected me deeply'—(*Ibid* p. 20)। আরেক নেতা পি. বোরিসভ বলেছিলেন: 'The in-justice, violence and oppression of the landowners towards the peasants strengthened revolutionary ideas in my mind'—(*Ibid*, p. 20)

মানুষের মন বড়ো বিচিত্র, কার মন কোথায় বাঁধা আছে আবিষ্কার করা খুব সহজ কাজ নয়।

১৯১২ সালে লেনিন আলেকসান্দর হার্ৎজেনের জন্মশতবার্ষিকীতে লিখেছিলেন: 'We clearly see three generations, the three classes that were active in Russian revolution. At first it was nobles and landlords, the Decembrists and Hertzen. These revolutionaries formed but a narrow group. They were very far removed from the people. But their efforts were not in vain.' (*In Memory of Hertzen*, V. I. Lenin, Selected Works, vol. I. p. 526). আর Hertzen এই বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, 'They were veritable Titans, hammered out of pure steel from head to foot, comrade-in-arms who deliberately went to certain death in order to awaken the young generation to a new life and to purify the children born in an enviornment of tyranny and servility.' (*Ibid*, p. 524)

এদেশে বিপ্লব সফল হয় নি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না বলে নয়, সমস্যাকণ্টকিত এই উপমহাদেশের কঠিন বাস্তব পরিস্থিতিকে বিপ্লবের প্রয়োজনে সঠিক-ভাবে ব্যবহার করার মতো যোগ্য নেতৃত্ব এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন জন্ম দিতে সক্ষম হয় নি। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো লেনিন বা মাও বা হো চি মিনের জন্ম দিতে পারে নি—ওইখানেই তার ব্যর্থতা!

পার্টির জন্য বিপ্লব বসে থাকে না। যদি বাস্তব অবস্থা থাকে, তাহলে বিপ্লব ঘটে যায়; কিন্তু তার সফল পরিণতির জন্য দরকার এমন বিপ্লবী নেতার, যিনি সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সফল পরিণতির দিকে। রুশ দেশে ফেবরুয়ারি বিপ্লব বলশেভিক নেতাদের অনুপ-স্থিতিতেই ঘটেছিল। লেনিন ও জিনোভিয়েভ সুইটজারল্যাণ্ডে, ত্রৎস্কি আমেরিকাতে, স্তালিন সাই-বেরিয়ায়। পার্টিও ছিল নেহাতই ছোটো। অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল লেনিনের ফিরে আসার পর। লেনিন ছাড়া রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সফল হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

একথা অনেকেরই জানা আছে লেনিন পেট্রোগাদে ফিরে আসেন ৩রা এপ্রিল, এবং ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৭ তাঁর *April Thesis* বলে পরিচিত ঘোষণাকে পার্টিতে পেশ করেন। কিন্তু তাঁর সমর্থক পার্টি-নেতৃত্বে পাওয়া যায় নি। পার্টি পত্রিকা "প্রাভদা"র ৮ই এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, 'As for the general scheme of Comrade Lenin, it seems to us unacceptable in that it starts from the assumption that the bourgeois-democratic revolution is ended, and counts upon an immediate transformation of this revolution into socialist revolution' (Ibid, vol I, p 312).

তেমনি লেনিনের Immediate Insurrac-tion-এর পক্ষেও পার্টি নেতৃত্বের এক বড়ো অংশ প্রথমে তাঁকে সমর্থন করেন নি। ১৯১৭-র ২৮শে সেপটেমবর লেনিন তাঁর *Crisis in Ripe* প্রবন্ধে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'We must acknowledge the truth that there is in the Central Committee and upper circles of the Party a tendency or an opinion in favour of waiting for the Congress of Soviets, against the immediate seizure of power, against immediate insurrec-tion.' (Ibid, vol III, p 135).

অকটোবর বিপ্লবের আগের দিন তাঁর বিখ্যাত

সেই চিঠিতে (*A Letter to the Members of the Central Committee*) লেনিন লিখেছিলেন, 'I exhort my comrades with all my strength to realize that everything now hangs on the thread, that we are being confronted by problems which cannot be solved by conference or congresses (even Congress of Soviets), but exclusively by people, by the masses, by the struggles of the armed masses.' সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, 'History will not forgive revolutionaries for procrastinating when they could be victorious to-day (while certainly be victorious to-day) while they risk losing much, in fact, everything tomorrow' (Selected Works, p 140-141, Foreign Languages Publishing House, Moscow 1947, vol. II).

অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ এবং সঠিক স্লোগান দেবার মতো নেতা রুশ বিপ্লবে লেনিন ছাড়া আর কেউ ছিলেন না সেদিন—এটা প্রমাণিত সত্য। কাজেই পার্টি থাকলেই সফল বিপ্লব হবে—একথা বলা যাবে কিনা সেটাও এখানে বিচার্য। পার্টি বহু দেশেই ছিল, কিন্তু সফল বিপ্লব ইউরোপের কটি দেশে হয়েছে সার্থকভাবে?

চৌধুরী সাহেব সমস্যার সহজ সমাধান দিয়েছেন একটি পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে। লেনিন *What is to Done?* গ্রন্থে যে সময় এবং পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর পত্রিকার কথা লিখেছিলেন, প্রায় একশ বছর পরে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার কতটা মিল আছে, সেটা এক্ষেত্রে বিচার করে দেখলে এ সমাধান চলবে কিনা সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

চৌধুরী সাহেব এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা মার্কসবাদসম্মত কিনা, সেটা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। তবে একটা কারণে সবাই তাঁকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ দেবেন। তিনি বহু পরিশ্রমে এদেশের সাম্যবাদী তথা জাতীয় আন্দোলনের বহু তথ্য এই বইতে শামিল করেছেন, সেটাকে নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারবেন সমাজবিজ্ঞানী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী পাঠকবর্গ।

বিদেশের এবং স্বদেশের কিছু কবিকৃতি

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকবিতার সঙ্গে বাঙলা কবিতার সংযোগ যে আজ কত নিবিড় এবং মেলবন্ধন কত ঘনিষ্ঠ, তার উজ্জ্বল প্রমাণ অক্তাভিও পাজ ১৯৯০-এ নোবেল প্রাইজ পাবার পর মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ৯১-এর বইমেলায় বেরিয়ে গেল তাঁর কবিতার অনুবাদগ্রন্থ। বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে এজাতীয় তৎপরতা নিশ্চয় শ্লাঘনীয়। না, বইটি কলেজ স্ট্রীট বইপাড়া থেকে বেরোয় নি। বইটি প্রকাশ করেছেন মেদিনীপুরের "প্রকাশনা"। অনুবাদক বিপ্লব মাজী নিজে কবি। কয়েক বছর ধরেই তিনি তাঁর লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে পাজের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করে আসছিলেন। অক্তাভিও পাজ নামটি দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর কাব্যক্ষেত্রে বহুদিন যাবৎ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। লাতিন আমেরিকার কবি বলতে নেরুদার পরই তাঁর নাম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু শুধু লাতিন আমেরিকা বা স্প্যানিশ ভাষা নয়, একের পর এক বই প্রকাশিত হতে থাকার পর আর বিশ্বের পাঠকমণ্ডলীতে মূলে ও নানা ভাষায় তাদের অনুবাদের ফলে, অক্তাভিও পাজ আজ বিশ্বকবিতার স্তম্ভ। নেরুদা নেই, কিন্তু পাজ আমাদের মধ্যে আজও রয়েছেন—যে-কোনো কবিতাপ্রেমীর পক্ষে এ গভীর আশার আনন্দের সংবাদ। পাজের জীবন, জীবিকা ও কবিতায় ভারতবর্ষ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ এক দীর্ঘ সময় তিনি কর্মসূত্রে ভারতের বাসিন্দা। ভারতের মাটি মানুষ দর্শন এই মহান কবিকে আকৃষ্ট করেছিল এবং মহত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিল। তাই তিনি আমাদের বড়ো আপন। আমাদের প্রসিদ্ধ কবিরা পাজের কবিতা অনুবাদ করেছেন। বাঙলা ভাষায় মাঝে-মাঝেই তাঁর কবিতার অনুবাদ হয়ে আসছে বোধহয় সেই মৈত্রীচেতনা থেকেই। কিন্তু তাঁর অনেকগুলি কবিতার নিজস্ব অনুবাদ একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ বই প্রকাশ করে বিপ্লব মাজী আমাদের খুব উপকার করলেন।

প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে পুরো বইটি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকর্ম হয়ে উঠেছে। কবির জীবন এবং কবিতার ওপর একটি মূল্যবান ভূমিকা এ বইটির অপরিহার্য অংশ। কিভাবে একজন কবি মহত্ত্বে উন্নীত হন, তাঁর কবিতা রচনার পথ কিরকম জটিল, কবিতার চর্চায় জীবনের ভূমিকা কী, কিভাবে তাঁর যৌবন কেটেছে, তাঁর কবিতার পরিণতিতে আর কোন্-কোন্ কবিদের দায়িত্ব বর্তায়, তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনা কেমন অঙ্গাঙ্গী জড়িত—এইসব জ্ঞাতব্য তথ্য মনোরম ভাষায় অনুবাদক আমাদের জানিয়েছেন। ফলে পাজের কিয়ৎপরিমাণে জটিল কবিতা পাঠে সহায়তা পাওয়া যায়। বইয়ের শেষাংশেও একটি আলোচনার সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটিতে কিছু ছোটো কবিতা ছাড়াও পাজের প্রধান এবং প্রসিদ্ধ কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা যথেষ্ট যত্ন নিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। দীর্ঘ কবিতাগুলি হল কবির সমাধি, ট্রাউব্রীজ স্ট্রীট, ধ্বংসের মধ্যে স্তোত্র, নদী, ভাঙা জলপাত্র, প্রত্যাবর্তন, এইসব শব্দের মধ্যবিন্দুতে, সমস্ত কম্পাসবিন্দু থেকে বাতাস এবং দুটি বাগানের উপকথা। এই কবিতাগুলি মানুষের সৃষ্টির ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ। তাই এগুলির বাঙলা রূপান্তর বাঙলা কবিতাকে পুষ্ট করবে যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু "সূর্যপাথর"-এর অনুবাদ নেই কেন?

বইটির প্রচ্ছদে পাজের মুখের বিশাল চিত্র এবং নামাঙ্কনের শৈলী বইটিকে আকর্ষণীয় করেছে।

যেসব কবি বা লেখকের খ্যাতি তাঁদের স্বদেশেই বদ্ধ থাকে, অনেক সময় নোবেলপ্রাইজপ্রাপ্তি তাঁদের জগৎসভায় হাজির করতে সাহায্য করে। কোনো-কোনো কবির খ্যাতি নোবেল প্রাইজের তোয়াক্কা করে না। তাঁদের নাম আর কবিতা বিশেষ দেশ আর ভাষার গণ্ডি ছাড়িয়ে আবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ে কবিতার সামর্থ্যেই। কহলিল জিব্রান এক মহান কবি। পশ্চিম এশিয়ার যে ভূখণ্ড আজ অবিচ্ছিন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কেন্দ্র, সেই লেবাননের কবি জিব্রান, মাত্র ৪৮ বছর বয়সে, পৃথিবীকে ছেড়ে গেছেন। তিনি মূলত কবিতা লিখেছেন আরবিতে,

অক্তাভিও পাজের কবিতা—বিপ্লব মাজী। প্রকাশনা, শরৎপল্লী, মেদিনীপুর। পঁয়ত্রিশ টাকা॥ **দি প্রফেট**—কহলিল জিব্রান। অনুবাদক অজিত মিশ্র। অমৃতলোক, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর। কুড়ি টাকা॥ **ছড়ায় নাছড়ায় কলকাতা**—সম্পাদক মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দ. চব্বিশ পরগনা। কুড়ি টাকা॥ **প্রকৃতির প্রতিকৃতি**—সুবোধ সেনগুপ্ত। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দ. চব্বিশ পরগনা। বারো টাকা॥ **ভালোবাসা এপার ওপার**—সুবোধ সেনগুপ্ত। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দ. চব্বিশ পরগনা। ষোল টাকা॥ **যাও মেরু ভাঙো প্রেম**—সুভাষ সাহা। প্রকাশনা, মেদিনীপুর। দশ টাকা॥ **আলোর মোহর আছে জলে**—নীতীশ চৌধুরী। তরুণ পাবলিশার্স, ২৯ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। বারো টাকা॥ **নেশায় আছি জেগে**—কালোবরণ পাড়ই। অমৃতলোক, মেদিনীপুর। পনেরো টাকা॥ **যতিচিহ্নের পর**—দিলীপ দাস। অমৃতলোক, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর। পাঁচ টাকা। **বেঁচেবর্তে থাকার পিছনে**—অমলেন্দু ভট্টাচার্য। প্রকাশক—তুহিনা ভট্টাচার্য। মেদিনীপুর। পাঁচ টাকা॥ **সোনার জল**—কমল চক্রবর্তী। অমৃতলোক, মেদিনীপুর। পনেরো টাকা॥

জীবনের শেষের দিকে কিছু ইংরেজিতে। জিব্রানের খ্যাতি এবং পাঠক জগৎজোড়া। তাঁর "দি প্রফেট" কাব্যগ্রন্থ ১৯২৩-এ প্রকাশের পর বহু বছর আন্তর্জাতিক বাজারে বেস্টসেলার ছিল। এই বইটির সহজ সাবলীল অনুবাদ করেছেন অজিত মিশ্র এবং প্রকাশ করেছেন মেদিনীপুরের "অমৃতলোক"।

বাঙলা ভাষায় জিব্রানচর্চা যে ক্রমশ বাড়ছে তা বোঝা যায় এমন অমূল্য কাব্যগ্রন্থের মনোযোগ-সহকারে অনুবাদ ও প্রকাশসৌষ্ঠব দেখে। কারণ বছর কয়েক আগে আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহের অনুবাদে "কহলিল জিব্রানের শ্রেষ্ঠ কবিতা" পেয়েছিলাম। মনস্বী আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রেরণায় উক্ত কবিদ্বয় জিব্রান অনুবাদে নিয়োজিত হয়েছিলেন, আর অজিত মিশ্র "দি প্রফেট" অনুবাদ করেছেন 'এক অপরিসীম ভালোলাগার বোধ থেকে।' বইটি পড়ার পর আমার যে অনুভব হল অনুবাদকের ভাষাতেই তা প্রকাশ করা সহজ বিবেচনা করলাম। তিনি লিখেছেন: 'জিব্রানের সাহচর্যে জীবনের অর্থ বদলে যায় মুহূর্তে, বদলে যায় পৃথিবীর রঙ, অজ্ঞাতসারেই জিব্রান সঞ্চারিত করে দেন এক বিশ্বাস-বোধ; মানুষের প্রতি, জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের আলোয় তখন যেন উত্তরণ ঘটে ব্যক্তি-মানুষের।' জিব্রানের কবিতা নিছক কবিতা নয়। এক প্রগাঢ় দর্শন। এই কবিতার বইটিকে এক মহান কবির দার্শনিক অভিজ্ঞতার, উপলব্ধির বাণীরূপ বলা যেতে পারে। খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মদর্শনের মূল বোধগুলি কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। পড়ার কালে মনে হয় ভারতীয় প্রাচীন দর্শনের সঙ্গেও যেন ঐক্য রয়েছে। যেমন ভালোবাসা বিষয়ে এক জায়গায় প্রফেট বলেছেন: 'ভালোবাসা অধিকার করে না, কিছুই, না তাকে অধিকার করা যায় / কেননা ভালোবাসা সুসম্পন্ন / ভালোবাসাতেই' কিংবা আত্মজ্ঞান বিষয়ে: 'কোনো কিছু দিয়ে মাপতে চেয়ো না তোমার জ্ঞানের গভীরতা/ ছুঁতে চেয়ো না তার শব্দসীমা। / কেননা, তোমার তুমি তো সীমাহীন, পরিমাপহীন।'

"দি প্রফেট" একটি অখণ্ড কবিতার বই। এর কবিতাগুলি একসূত্রে গ্রথিত, আলাদা-আলাদা কোনো কবিতা নয়। মহাজ্ঞানী আল মুস্তাফা অর্ফালেস নগরীতে বারো বছর কাল কাটিয়েছেন। একদিন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর জাহাজ এল। জাহাজে ওঠার আগে জনপদের আবালবৃদ্ধবনিতা কাতর হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরল এবং জীবন ও পৃথিবীর নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে চাইল তাঁর উত্তর। এই জ্ঞানপিপাসু মানুষদের তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, তা নিয়েই এইগ্রন্থ। তিনি বলেছিলেন বিবাহ, শিশু, দান, কাজ, গৃহ, আনন্দ ও দুঃখ, ধর্ম, মৃত্যু, সুন্দর, প্রমোদ প্রভৃতি বিষয়ে। বরং বলা যায়, কী বিষয়ে তিনি প্রশ্ন পান নি এবং উত্তর দেন নি? সাধারণ মানুষের পথচলা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অনেকটা সুগম করতে পারে এরকম একটি গ্রন্থের মনোযোগী পাঠ। বিভিন্ন বিষয়ে কবিতার বিভিন্ন স্তবক মুখস্থ করে রেখে দেবার মতো। এমনকী যাঁরা কবিতা পড়েন না, জীবনযাত্রার ঝনঝাটে কাব্যরস উপভোগের সময় পান না, তাঁরাও এই বইটি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন, কারণ বইটি তাঁদের দিয়ে নিজেই নিজেকে পড়িয়ে নেবে।

বইটির পরিশিষ্টে সংক্ষেপে 'ধর্মদ্বেষী' কবিতা লেখার জন্য স্বদেশভূমি থেকে নির্বাসিত এবং প্রবাসে অকালপ্রয়াত কবির জীবনী রয়েছে। এ ছাড়া কবির আঁকা কয়েকটি ছবির প্লেট এবং তাঁর প্রতিকৃতি দেখার দুর্লভ সুযোগ পেলাম। কলকাতার বাইরে থেকে এরকম সুচারুরূপে সুচিন্তিতভাবে একটি পুস্তক প্রকাশ নিঃসন্দেহে গর্বের ব্যাপার।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত-সম্পাদিত "ছড়ায় না-ছড়ায় কলকাতা" কলকাতা নিয়ে মজার-মজার ছড়ার সংকলন। প্রবীণ ও নবীন কবিরা ছড়া লিখেছেন। অনেক ছড়া যেমন স্মরণীয় হয়ে থাকবার মতো, তেমনি কিছু রচনাকে ছড়া বলা যায় না। সেগুলি এই সংকলনের মুখ চেয়ে লিখতে গিয়েই পা পিছলেছে কিনা বোঝা গেল না। যেমন সুধীরমোহন চট্টোপাধ্যায়, শিবময় দাশগুপ্ত প্রমুখের। আনন্দ বাগচী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, রতনতনু ঘাটী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা ও শ্যামল সেনের ছড়াগুলি কলকাতার মৌলিক চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। কিন্তু এই সংকলনে অন্নদাশংকর রায়ের ছড়া নেই কেন? বাঙলা ছড়ার এই মাইয়েস্ত্রো কি কলকাতা নিয়ে কোনো ছড়াই লেখেন নি? কলকাতা নিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও চমৎকার ছড়া আছে। সম্পাদক সেগুলি সংগ্রহ করার শ্রম স্বীকার করেন নি। হাতের সামনে যেমন পেয়ে গেছেন তেমন নিয়ে নিয়েছেন, সেগুলি কাঁচা কিনা যাচিয়ে দেখেন নি। এমন একটি সংগ্রহযোগ্য বই সম্পাদনা করলেও সম্পাদকের নিজের ছড়াটি কিন্তু ভালো লাগে নি।

সুবোধ সেনগুপ্তের "প্রকৃতির প্রতিকৃতি" এবং "ভালোবাসা এপার ওপার" মূলত ছোটো-ছোটো কবিতার সংকলন। সংক্ষিপ্ত বাচনে তিনি নানা মনোভাব প্রকাশ করেছেন। বাগ্‌বাহুল্য নেই। কবিতাগুলির নামও এক শব্দের এবং বেশ ইঙ্গিতময়, যেমন—আলো, স্বপ্ন, সংশয়, সংকট, স্বীকার, দ্বন্দ্ব, সন্ধান, মেঘ, ধ্বস, গোধূলি ইত্যাদি। তাঁর উপমা বা চিত্রকল্প সাবেকি। ভাষা ও ভঙ্গিমা সরল। কবিতাগুলি তর-তর করে পড়া যায়। এত সারল্য কি ভালো? তাতে কি কবিতা থেকে রহস্যময়তা বাদ যায় না? উভয় গ্রন্থেই কিছু কবিতা বাদ দেওয়ার ব্যাপারে কবির নিষ্ঠুর হওয়া উচিত ছিল।

'সুভাষ সাহার কবিতায় চেতনা ও অবচেতনের সন্ধিক্ষণ যেখানে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের ভেদরেখা মুছে, আপাত বাস্তবতা নয়, প্রকৃত ও অনন্ত বাস্তবতার প্রকাশ; যেখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একে অপরের সঙ্গে আচমকা মিশে ক্ষুদ্র সময়-খণ্ডের আধারে…' ইত্যাদি যে ভাবগর্ভ বাণী সুভাষ সাহার কবিতার বই "যাও মেরু ভাঙো প্রেম"-এর পেছনের মলাটে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে, তা বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল। বইটি পড়ার পর একথা বলছি। তিনি নিশ্চয় কয়েকটি ভালো কবিতা লিখেছেন। কবিতার ওপর তাঁর দখলের প্রমাণ মেলে এইরকম সব উচ্চারণে: 'ব্রীজের শুরুতে দেখা, কিম্বা দেখা নয়, হয়না কখনো/ শুধুই আগুন / যুগল হাতের মুঠি ভেঙে ধুয়েছি শরীর— মানুষে মানুষে / এই অঙ্গীকার' (আমার মৃত্যু) অথবা 'এই তীক্ষ্ণ নদীঘাট, কোথায় সুজন?/ কোথায় কজন তাকে পরিচিত সুজন জেনেছে/ পুষ্ট কোষে নীল বায়ু-তাপ।' (কোথায় সুজন)।

নীতীশ চৌধুরীর "আলোর মোহর আছে জলে" গ্রন্থের নাম থেকেই তাঁর এ বইয়ের মূলসুর ধরা যায়। তা হল আলো আর জল। আলোয় ঝলমলে জল, মাটি, গাছপালা তথা প্রকৃতির কথায় পূর্ণ তাঁর কবিতাগুলি। তিনটি কবিতার প্রথম লাইনগুলি এরকম: 'সূর্য ছুটিতে গেলে সন্ধ্যা তার পাখীর চারণায় অন্ধকার ঘাটে রাখে, তারপর জলে' (বসতি), 'নদীর তরঙ্গ সব মোহনায় নীল হয়ে যায়' (শেষ ডাকে) এবং 'সুগভীর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নায় ডুব দেয় আকাশের তারা, / চাঁদের স্নেহের স্পর্শে জেগে ওঠে পৃথিবীর ঘাস' (অধরা)। প্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মতা কবিতাগুলিকে স্বচ্ছতা দিয়েছে। কোথাও আবেগের মাত্রা বেশি। কয়েকটি চমকপ্রদ উপমার ঝলকানি রয়েছে, যেমন—'এখন চাঁদ / সুদক্ষ খেলোয়াড়ের জিতে আনা বশংবদ কালের মত'।

কালোবরণ পাড়ই 'নেশায় আছি জেগে' গ্রন্থে যতগুলি কবিতা অন্তরভুক্ত করেছেন তার কিছু নির্মমভাবে বাদ

দিলে বইটির গুরুত্ব বাড়ত। তাঁর ভাষা অগোছালো, এলোমেলো এবং অতিরিক্তভাবে বিধুর। চিত্রকল্প রচনার মাধ্যমে কবিতা সৃজনের বদলে তাঁর মধ্যে বিবৃতিপ্রবণতা বেশি। ফলত তেমন উল্লেখযোগ্য উপমা বা রূপক রচনা করতে তাঁর কলম বিমুখ হয়েছে। যদিও তিনি একটা দামি কাজ করতে পেরেছেন। কাঁসাই-রূপনারায়ণের দেশ মেদিনীপুর জেলার বিশেষ ভূখণ্ডের চিত্র মাঝে-মাঝেই কালো-বরণের কবিতায় ফিরে এসেছে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—'দিশেহারা মানুষ শুধু হতাশার তীব্র শিকার/পৌরুষের অভাব-বোধে সারাটা পৃথিবী ম্রিয়মাণ / বিচ্ছিন্নতা, সন্ত্রাস, আত্মহনন যেন সর্বত্র প্রকট'—খুব উপযুক্ত এবং সময়- ও সমাজ-সচেতন কথা। কিন্তু কথা বা প্রখর সমাজচেতনা যে ভাষার জাদুতে নিছক বিবরণ থেকে কবিতার মাত্রা অর্জন করে, তা কি এখানে পাওয়া গেল? পূর্ণেন্দু পত্রী-কৃত বইটির প্রচ্ছদ মনে রাখার মতো।

আঠারোটি কবিতা নিয়ে চল্লিশ পাতার পুস্তিকা "মতিচিহ্নের পর"। দিলীপ দাস কয়েকটি আবেগ-দীপ্ত কবিতা লিখেছেন। ঝড়, অনুভব, রেখা, গল্প এবং চেয়ে থাকা পড়ে ভালো কবিতা পড়ার স্বাদ পেলাম। দিলীপ দাস এই পুস্তিকাটি বের করে আশা জাগিয়েছেন। তিনি আরো লিখুন। এইরকম আর-একটি নিরাভরণ পুস্তিকা অমলেন্দু ভট্টাচার্যের "বেঁচেবর্তে থাকার পিছনে" পড়ে মুগ্ধ হলাম। এতে কবিতা আছে মাত্র কুড়িটি কিন্তু যথেষ্ট মনোযোগ দাবি করার মতো কবিতা। কবিতাগুলিতে জীবনের সারমর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা। যোগ্য জোরালো ভাষায় গভীর উচ্চারণ: 'আমরা জ্বলন্ত রুমালের ভিতর সময়প্রবাহের লীনতাপ / খুঁজি। জন্মসূত্র খুঁজি। / নগ্ন চৌম্বক-ক্ষেত্র তৈরী করি। / পৃথিবী এসময় সৌর-রেস্তোঁরার মতো। আমরা ঢুকে বলি, আগুন খাবো।' (জ্বলন্ত রুমালের নন্দনতত্ত্ব)

"সোনার নাও পবনের বৈঠা" এবং "সোনার জল" এই দুটি অন্ত্যজাতের একাঙ্ক নিয়ে কবি কমল চক্রবর্তী নাট্যকারের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন "সোনার জল" গ্রন্থে। নাটক দুটিই পরীক্ষামূলক। নাটক রচনার প্রথা ভঙ্গ করেছেন তিনি। এবং এমন একাঙ্ক দুটি নিয়ে বই বের করে সাহস দেখিয়েছেন "অমৃতলোক"। আলাদা ঘরানার নাটকের বইটি আবার উৎসর্গ করা হয়েছে এদেশে অন্ত্যজাতের নাটক লেখার হোতা বাদল সরকারকে। কিন্তু ভূমিকার শুরুতেই কমলবাবু কেন জানালেন, 'আসলে এটি একটি গল্পগ্রন্থ' তা বোঝা গেল না। প্রথম রচনাটিকে আমার নাটক বলেই মনে হয়েছে, গল্প নয়; এবং এর মধ্যে শুধু 'রিডেবিলেটি' নয়, মঞ্চে প্রযোজনা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদিও দ্বিতীয় রচনাটি নাটক হয়ে ওঠে নি, এমনকী তা গল্পও হয়েছে বলে মনে হয় না। আসলে "সোনার নাও" যেমন উতরেছে, "সোনার জল" উতরোয় নি। প্রথম একাঙ্কটিতে চরিত্রগুলি ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করেছে, আমাদের আকর্ষণ জাগিয়েছে, তারা মিলিতভাবে মাঝে মাঝে জটিল আর মজাদার পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং একক চরিত্র হিসেবেও বিশেষত্ব পেয়েছে। পরের একাঙ্কটি এইসব গুণ অর্জন করতে পারে নি। মনোলগ কখনো-কখনো একঘেয়ে লাগে। তালফেরতা ঘটে না। যদিও বাবা ও দীপেনের চরিত্র নায়কের মুখের বর্ণনাতেই কখনো প্রাণ পেয়ে যায়। আমরা তাদের দেখতে না পেলেও শুনে-শুনে চিনতে পারি। মধ্য-বিত্তের দুই প্রতিভূ বাবা ও দীপেন। ছেলে রক্তদান করলে বাবা তুমুল হইহল্লা, এমনকী কান্না জুড়ে দিয়ে বলে, 'আমি গায়ের রক্ত করুম খাওয়াইয়া পরাইয়া, আর তুই দান করবি। এ চলতে পারে না।' অন্যদিকে দীপেন ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধের স্পেসিমেন ফাইল জড়ো করে পতিতাপল্লীতে বিলিয়ে আসে। মধ্যবিত্তের জটিল ও চমকপ্রদ জীবন আর

মানসিকতাকে ধরার যতটা সুযোগ ছিল, যার আঁচ পাওয়া গেছে, কমলবাবু কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রথম একাঙ্কে খোকা (কেরানি ও ক্যাডার), কামাল (উটওলা), অনমিতা (সাংবাদিক), ভবসিন্ধু (ভবঘুরে)—এই চারটি চরিত্রের পরস্পর-ক্রিয়ায়, এক রাত্রের ঘটনায়, তাদের মনের গহনের আশা-স্বপ্ন-ব্যর্থতা-ভয় অ্যাবসার্ড নাট্যরীতিতে দক্ষতার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। দুটি একাঙ্কেই তিনি সংলাপের সঙ্গে ছড়া আর গানকে সুষমভাবে মিলিয়েছেন। অবশ্য অভিনয়কালে পরিচালকের সম্পাদনার সুযোগ যে রয়েছে তা স্বীকার করা দরকার।

কমলবাবু পাঠযোগ্য নাটকের অভাব থেকে এই দুটি লেখায় প্ররোচিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু শুধু পাঠযোগ্য কেন, বাঙলা মঞ্চে অভিনয়-যোগ্য উঁচুমানের নাটকেরও কি কম অভাব? সেক্ষেত্রে কি খুব সচ্ছল দশা? নাট্যপরিচালকদের বিবৃতি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি পড়ে তা তো মনে হয় না। অভাব বলেই না বছরের পর বছর এমন অকাতরে বিদেশী নাটকের অনুবাদ আর রূপান্তর করে গ্রুপ-গুলোকে টিঁকে থাকার লড়াই চালাতে হয়। তাই যেসব কবি গল্পকার নাটক লিখতে এগিয়ে আসবেন, তাঁরা বাঙলা মঞ্চের উপকার করবেন। সেদিক থেকে কমলবাবুর প্রয়াসকে ধন্যবাদ।

লোগোসেনট্রিজম্ : ভর্তৃহরি, দেরিদা ও মতিলাল

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি প্রয়াত বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ভারতীয় ভাষা-তত্ত্বের দর্শন বিষয়ে বই লিখেছেন। যতদূর জানি, মৃত্যুর আগে এটিই তাঁর শেষতম বড়ো কাজ। অতএব বইটি নিশ্চয়ই মনোযোগ দাবি করে।

মতিলাল কৃতবিদ্য পুরুষ। সংস্কৃত এবং দর্শনের পরম্পরাগত চর্চার শেষে তিনি হারভার্ডে গবেষণা করেন। বিবিধ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী তাঁর ছিল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অক্সফোর্ডের স্পল্ডিঙ অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। নৈয়ায়িক মতিলাল ছিলেন ছুঁদে পণ্ডিত—বিচারে আপোস করেন নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে পশ্চিমী দর্শন, বা বলা ভালো, বিলেতে তার যেটুকু চর্চা হয়, সেই লজিক শিখে-ছিলেন। এয়ার, কুইন, স্কিনার, স্ট্রসন—এঁদের নাম হরবখত তাঁর লেখায় পাব। একটু-আধটু ফ্রেগেও। লজিক এবং এপিস্টেমোলজিতে তাঁর আরাম, এথিক্স্ আর সামাজিক দর্শন এড়িয়েই থেকেছেন।

মতিলালের বইগুলি ক্রমান্বয়ে পড়ে আমার মনে হয়েছে যে মাপকাঠিটা বসিয়ে দিয়েছে 'ওরা' অর্থাৎ অক্সব্রিজের মাস্টার মশাইরা। বাকি যা করার তা হল সেই মাপকাঠির সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখা আর ফলাফলগুলো বই লিখে বা পেপার করে জনসমক্ষে ঘোষণা করা। মতিলালের চরম দুর্ভাগ্য যে তাঁর সেরকম প্রতিপক্ষ ছিল না। কিছু সাহেব শ্রোতা ছিল—তারা য়ুরোপীয় দর্শনের নিকৃষ্ট অংশের প্রতিনিধি। আর ছিল বা আছে—কিছুসংখ্যক সংস্কৃত-জানা টুলো পণ্ডিত। বৎসরান্তে মতিলাল তাঁদের কাছে এসে প্রয়োজনীয় রেফারেন্সগুলো নিয়ে যেতেন। একেবারে 'নেটিভ ইনফরম্যানট / মাস্টার ডিসকোর্স'—কথাটা মতিলালের বান্ধবী গায়ত্রী স্পিভাকের। মন্তব্যটা অবশ্য মতিলালের উদ্দেশ্যে নয়।

আলোচ্য বইটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে (ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত) সাধারণভাবে ধ্রুপদী ভারতীয়

The Word and the World : India's Contribution to the Study of Language—Bimal Krishna Matilal. Oxford University Press. 1990, Rs. 179·00.

দর্শনের ভাষা-বিষয়ক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করানোর একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে "ভাষাতত্ত্ব" বলে সে সময়ে কিছু ছিল না। মস্ত বড়ো করে সংস্কৃত ভাষা আর ব্যাকরণ চর্চার একটা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। মতিলাল সেটাকেই টেনে-টুনে ভাষাতত্ত্ব করে দিয়েছেন। ফলে কিছু বিপত্তি দেখা দিয়েছে। ক্রমাগত "দেবভাষা" সংস্কৃত ধরেই সব আলোচনা এমনভাবে চলছে যে, সাধারণভাবে 'ভাষা' ব্যাপারটা নজরেই আসে নি—এর তাৎপর্য নিগূঢ়। মতিলাল অবশ্য বিপত্তিটা লক্ষ করেন নি।

"কারক" নিয়ে একটি সুলিখিত সন্দর্ভ পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে। মতিলাল এ সম্পর্কে সচেতন যে "কারক" ক্যাটেগরিটি অনেক ভাষাতেই নেই। কারকের ধারণাই নেই। এখন "ভাষাতত্ত্ব" বললে যে -কোনো ভাষাই বোঝাবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি বিশেষ দিক নিয়ে ভাষাসংক্রান্ত সাধারণ আলোচনায় কথা বলাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? মতিলাল আবার কারকের দার্শনিক তাৎপর্যের দিকেও গেছেন।

'ভাষা থেকে জ্ঞান কিভাবে আসবে' (ষষ্ঠ অধ্যায়) —এই প্রশ্নটার গায়ে অ্যানালিটিক্যাল ফিলজফির গন্ধ। নিদেনপক্ষে, সংস্কৃত ব্যাকরণবেত্তাদের কাছে এটা কোনো প্রশ্নই নয়। মেটাল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞ তথা দার্শনিকদের কিছু বক্তব্য থাকলেও থাকতে পারে। ভারতীয় গাণিতিক সন্দর্ভ-গুলি নাড়লে হয়তো কিছু পাওয়া যেত। টারস্কির মনোযোগী পাঠক মতিলাল এটা করতে পারতেন, কিন্তু করেন নি।

বইটির দ্বিতীয় অংশের প্রায় সবটা জুড়েই রয়েছেন ভর্তৃহরি, "বাক্যপদীয়"-নামক সন্দর্ভ-প্রণেতা। ভর্তৃ-হরি নিয়ে মতিলালের বক্তব্য অনেক, কখনও তা পরস্পরবিরোধীও। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপাতত মতিলালের ভর্তৃহরি অবসেশন নিয়ে কিছু বলি।

মতিলালের ভর্তৃহরি-পাঠ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেন বসলাম বলি। পূর্ব-ইউরোপের ফর্মালিস্টদের বাদ দিলে, ফার্দিনান্দ সোস্যুরের সময় থেকে য়ুরোপে ভাষাতত্ত্ববিষয়ক চিন্তাভাবনা নতুন খাতে বইতে শুরু করে। এসব পুরোনো কথা, অনেকেই জানবেন, অতএব সংক্ষেপে সারছি। এই "নতুন" ভাষাতত্ত্ব এক-লাফে তার অগ্রজ তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব (Philology)-কে পিছনে ফেলে দেয় নিছক একটি ধারণার জোরে: যে ভাষা একটি চিহ্নসমষ্টি মাত্র। সোস্যুরের তাত্ত্বিক প্রকল্পের দুটি বর্শাফলক: (১) ভাষা-নামক চিহ্নসমষ্টির চিহ্নগুলি নিছকই কাকতালীয় বা সামাজিক ব্যবহারজাত (গোরু প্রাণীটির বা 'ধারণা'টির সঙ্গে 'গোরু' শব্দটির কিছু করার নেই)—ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নরা আরবিট্রারি। (২) ভাষার চিহ্নসমষ্টির অন্তঃস্থ অর্থ কিছু নেই। অর্থ আসে একটি চিহ্নের সঙ্গে অপরটির বিরোধ তথা বৈপরীত্যের (opposition) মধ্য দিয়ে। 'গোরু'-র অন্তর্নিহিত অর্থ কিছু নেই। অর্থ আসবে সমশ্রেণীর অন্যান্য শব্দ—কুরু, হারু ইত্যাদির সঙ্গে তার বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে। সোস্যুর অবশ্য খুব নতুন কিছু বলেন নি। পিয়ার্সের চিহ্নের সংজ্ঞার্থ—'something which stands to somebody for something in some respect or capacity', চিহ্নের ধ্রুপদী ধারণা (স্টোয়িকদের সময় থেকে)—'aliquid a stat pro aliquo' থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু এই সাদৃশ্য অল্প কিছুদিন হল মাত্র গোচর হচ্ছে। সোস্যুরের ভাষাতত্ত্বকে মডেল করে নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমালোচনা—এসবের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। সব-চেয়ে বড়ো কথা হল, পশ্চিমী দর্শনের ধারাটাই নিছক চিহ্নের ধাক্কায় অনেকটা পালটে গেল। ফরাসিদেশে বিশ শতকে তিরিশ-চল্লিশে হিপোলিত-কোজেভের হেগেল নিয়ে মারামারি করছিলেন। হঠাৎ চিহ্ন ও লেভি-স্ত্রোস এসে সব উলটে দিল। তারপর পঞ্চাশ-ষাটে এসে স্ট্রাকচারবাদ ক্রমশ বন্যার মতো আমেরিকায় ঢুকে পড়ল। পরে উত্তর-স্ট্রাকচারবাদ ও বিনির্মাণ—এখনও আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে। আমেরিকায় বিনির্মাণ বাজার মাত করায় মতিলালের সংরক্ষিত বাজারেও হাত পড়ল। অ্যানালাইটিক্যাল ফিল-জফির লোকেরা সেখানকার দর্শনের বাজারে আর তত কল্কে পায় না। মতিলালের পাঠক সাহেব বলে তিনিও চাল পালটালেন। প্রৌঢ় বয়সে ভাষাতত্ত্বের দর্শন নিয়ে পড়লেন, প্যারিসে দেরিদার ইস্কুলে বক্তৃতা দিতে ছুটলেন, এবং এই বইটি লিখে দাবি করলেন তে আমাদের মহামানবের সাগরতীরে ভর্তৃহরি নামে এক ঋষি ছিলেন। সোস্যুর ও দেরিদা যা বলছেন তার প্রায় বারো আনাই তিনি বলে গিয়েছিলেন। বাকি চার আনা মতিলাল বলে দিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গম্ভীর দার্শনিক সমালোচনা না করে এসব সামাজিক গল্পে যাচ্ছি কেন। এইজন্য যে, আমার অন্যতম প্রমেয় হল যে 'জ্ঞান' ব্যাপারটা চলে ক্ষমতার অঙ্গুলিহেলনে। মতিলালের বই তার উদাহরণ মাত্র। মতিলাল এতকাল বলে এসেছেন যে ভারতীয় দর্শনের সারবস্তু ছেঁকে নিলে তা থেকে আধো-আধো অ্যানালাইটিক্যাল ফিলজফি পাব। এখন, সহসা জানা গেল যে বাজারের পরিবর্তন-সাপেক্ষে তা থেকে চাইলে সোস্যুর বা দেরিদাও পাওয়া যেতে পারে। সারকথা: ভারতীয় দর্শন বলে যেটা চলে সেটা নিছকই পশ্চিমের পরিপাকের জন্য। মতিলাল নিমিত্ত মাত্র।

অতঃপর মতিলালের প্রকল্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। একাদশ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় তিনি ঘোষণা করছেন: 'the tradition (অর্থাৎ ভর্তৃহরি তথা ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের ঐতিহ্য), I argue, is free from the *fault* of logocentism', (fault কথাটা নজর করুন)। এই দাবির সপক্ষে এর আগে তিনি দুটি মাত্র প্রমাণ পেশ করেছেন:

(১) ভর্তৃহরি কস্মিন্‌কালেও 'লেখা' ব্যাপারটাকে গালি পাড়েন নি। অর্থাৎ তাঁর চিন্তায় নাকি ফোনোসেনট্রিজমের - মুখের কথাকে লেখার ওপর প্রাধান্য দেওয়া—আবেশ নেই।

(২) সোস্যুরের ভাষাবিষয়ক চিন্তাভাবনার সঙ্গে ভর্তৃহরির সুপ্রচুর মিল। এমনকী, সোস্যুরের মূল ক্যাটেগরিগুলির তুল্যমূল্য ক্যাটেগরি মতিলাল ভর্তৃহরি থেকে নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা করেছেন।

মতিলালের দাবি কতটা ধোপে টেকে সেটা বুঝতে হলে লোগোসেনট্রিজম ধারণাটার একটু আঁচ (তার বেশি গ্রন্থসমালোচনায় সম্ভব নয়) পেতে হবে।

বোঝা যাচ্ছে যে কথাটা গ্রীক লোগস থেকে এসেছে। আরিস্ততল বলেছিলেন যে মানুষ হল 'zoon logon echon'—লোগসের অধিকারী জন্তু। পরে, লাতিনে, সেটা হয়ে দাঁড়ায় 'animal rationale'।[১] এখন প্রশ্ন হল যে, লোগস মানে কী? উত্তর খুব স্বচ্ছ নয়। শব্দটির মধ্যে একই সঙ্গে যুক্তি (reason) ও ভাষার জায়গা রয়েছে—যেন এ দুটি পৃথক নয়। মজাটা সেখানেই। যেন ভাষা ও যুক্তি পরস্পরকে ধরে রয়েছে—মানুষী ভাষা, গ্রীক ভাষা, সত্যেরও ভাষা। উমবেরতো একো যেভাবে বলেছেন, 'Aristotle···identified the modes of being of Being (the categories) with the modes of being of language.'[২] এটাই হল ধ্রুপদী লোগাসেনট্রিজম: গোরু শব্দ ও গোরুর 'ধারণা'—এ দুয়ের মধ্যে কোথাও এক সাযুজ্য আছে। খ্রীষ্টধর্মও সেভাবে ভেবেছে—আদিতে ছিল শব্দ। অবশ্য লোগোসেনট্রিজম শুধু অতীতের দার্শনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু, রোজকার ভাষা মেটাফিজিক্স থেকেই উদ্ভূত, নিদেনপক্ষে তার বাইরে নয়, তাই কমবেশি যাবতীয় জাগতিক আপ্তবাক্যই কোনও না কোনও ভাবে লোগোসেনট্রিক। আরো: ভাষার মধ্যে থেকে (তার বাইরে যাওয়া অচিন্তনীয়) লোগোসেনট্রিজমের বাইরে বেরুনো যাবে না। তবে বাঁচোয়া এই যে এটা নিয়ে কথা বলা যাবে।

লোগোসেনট্রিজমের আধুনিক 'সংজ্ঞা' (?) -কে তাহলে যা যা আছে পরিপার্শ্বে অর্থাৎ সাধারণভাবে যেভাবে আমরা হয়েছি (being), তাকে প্রশ্নায়িত (problematise) করতে হবে। দেরিদা যেভাবে বলেছেন, আজকের দিনে লোগোসেনট্রিজমকে প্রশ্ন করার অর্থ হল, 'putting into question the major determination of Being as presence.'[৩] হাইডেগারীয় পরিভাষায় বললে, Being≡beings, ontology≡ontics—এসব অভেদকে প্রশ্ন করাই হল লোগোসেনট্রিজমের সমালোচনা। 'The problem of Being has the form of a question'—হাইডেগার জানাচ্ছেন। লোগোসেনট্রিজমের সমালোচনা হল আস্তিত্বা (beings)-দের কাছে হওয়ার, অস্তিত্বের (Being) self-presence, self-evidence-এর সমালোচনা। এ জিজ্ঞাসা বা সমালোচনা অসংলগ্ন, অসংবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। (দুই প্যারা-গ্রাফের পরিসরে আরিস্ততল থেকে দেরিদা পর্যন্ত দৌড় করানোর জন্য আমি পাঠকের কাছে ক্ষমা-প্রার্থী)।

এবার প্রশ্ন হল যে সোস্যুর এসবের মধ্যে কিভাবে এলেন। এইভাবে : তিনি বললেন যে, সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েডের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোনো সম্পর্ক নেই—যোগাযোগটা নিছকই কাকতালীয়। তাতে কী হল? প্রায় বিপ্লব। কারণ, ভাষার সঙ্গে বাস্তবতার আভ্যন্তরীণ, ইনট্রিনসিক যোগাযোগের যে কল্পগল্প আমরা এতদিন শুনে আসছি, ভাষা নামক চিহ্নের আরবিট্রারিনেসের সোস্যুরীয় সংস্কার তার মূলে কুঠারাঘাত করল। এই মহাবিশ্বে পিঁপড়ে বা জীবাণুরা তাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য যদি কোনো ভাষা বা সিগনাল-সমষ্টি বানায়, তার অর্থ (meaning) যা হবে, মানুষী ভাষার সিগনিফিকেন্স তার এক চুলও বেশি নয়। যেভাবে নীৎশে বলেছিলেন, তোমরা গাছকে বল পুরুষ আর সাপকে বল স্ত্রী (জর্মন ভাষার লিঙ্গ-বিচারটা সেরকমই)। তোমাদের স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা এত-দূর যে এই 'ভাষা' দিয়ে তোমরা প্রকৃতি/বাস্তবতা/ব্রহ্মাণ্ড তথা 'সত্য'কে বুঝতে চাও! কে বলল যে বাস্তবতা বা অভিজ্ঞতার সবটাই ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে?[৪]

অবশ্য সোস্যুর শুধু কাকতালীয়ত্বের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি। সোস্যুর বলেছিলেন যে, ব্যক্তির বা সমষ্টির উচ্চারণ (utterance, parole) বা শব্দ-ব্যবহারের বৈচিত্র্য বা অভেদ—এর কোনোটাই ভাষা-বিজ্ঞানের যথার্থ জ্ঞেয় বস্তু নয়। ভাষাবিজ্ঞানের যথার্থ জ্ঞেয় বস্তু হল 'লঙ্গ' (langue) যেটার সঙ্গে উচ্চারণের শ্রাব্যতার সম্পর্কই নেই।[৫] বার্ত ব্যাখ্যা করছেন :

"Saussure started from the "multiform and heterogeneous" nature of language, which appears at first sight as an unclassifiable reality the unity of which cannot be brought to light, since it pertakes at the same time of the physical, the physiological, the mental, the individual and the social. Now, this disorder disappears if, from the heterogeneous whole, is extracted a purely social object, the systematized set of conventions necessary to communication, indifferent to the material of the signals which compose it, and which is a language (langue) ; as opposed which speech (parole) covers the purely individual part of language... ... . The language (langue) is therefore, so to speak, language minus speech : it is at the same time a social institution and a system of values."[৬]

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বলছেন যে ভর্তৃহরির স্ফোটনাদ পৃথকীকরণের মধ্যে সোস্যুরের লঙ্গ-পারোল দ্বিত্বর ভ্রূণ লুকিয়ে আছে। এটার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করার জন্য মতিলালের ভর্তৃহরি-ব্যাখ্যা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'Bhartṛhari has posited three stages of language or speech. The first stage, where there is complete identity of language and thought, is called pasyanti stage ; we can call it 'non-verbal'. The 'intermediate' stage, where despite the identify of thought and language their difference is discernible, can be called the 'pre-verbal' stage. And the third the vaikhari stage, can be called the verbal stage.' (পৃ ৮৮)। অবশেষে, ৯৫ পৃষ্ঠায় উপসংহারে : "Bhartṛhari's philosophy of language is ultimately grounded in a monistic and idealistic metaphysical theory. He speaks of a transcendental word-essence (śabdatattva) as the first principle of the universe. His sphota doctrine is finally aligned with the ultimate reality (sic !) called śabda-brahman.' (পৃ ৯৫)।

এ সবই খুব সঠিক। কারণ বাক্যপদীয়র প্রথম কারিকাটিই হল :

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

অর্থাৎ : আদি ও নিধনরহিত, অক্ষর যে ব্রহ্ম (যাহা) শব্দতত্ত্বরূপে (পরিচিত), যাহা হইতে অর্থরূপে জগতের প্রতিক্রিয়ারূপ বিবর্ত হইয়া থাকে।[৭]

সোজা বাঙলায়, ভর্তৃহরি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। ঔপনিষদ আত্মতত্ত্বের মতো, তাঁর মতে 'শব্দতত্ত্ব'-ই একমাত্র সত্য। শব্দই 'ব্রহ্ম', সর্বব্যাপক। অর্থাৎ, তিনি যাকে 'শব্দ' বলছেন এবং যেটার ইংরেজি হবে language, word নয়, সেটা গ্রীক Logos-এর খুব কাছাকাছি। তবে এটা বলতেই হবে যে আরি-স্ততলের থেকে তাঁর তাত্ত্বিক সফিস্টিকেশন অনেক বেশি। আধুনিক দর্শনের ভাষায় বললে, ভর্তৃহরির শব্দব্রহ্ম হল, 'The Being of beings'। Being-টা নিজে একটা being নয়, তার অগ্র-পশ্চাৎ নেই। সেটা অ্যাবসোলিউট। সেজন্যই, সেটাকে সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে না। সেটার মানুষী কোরিলেট হল স্ফোট যা উচ্চারণ বা মুখের ভাষা নিরপেক্ষ। নাদ হল তার বহিঃপ্রকাশ। এবার ভর্তৃ-হরির 'ত্রয়ী বাক্'—পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীতে আসি। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অর্থপ্রতিপাদনের জন্য শব্দের স্থূলরূপ বা বৈখরী বাক্ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যাঁরা সিদ্ধ, যোগী, তাঁরা শব্দের এই স্থূলরূপের আড়ালে বিরাজকারী 'মধ্যমা' ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'পশ্যন্তী'-র সন্ধান পান। পশ্যন্তীতে ভাষা ও অর্থ বিচ্ছিন্ন নয়—তারা এক এবং অবিভাজ্য লোগসের অংশ মাত্র। মতিলাল এখানে কিঞ্চিৎ চালাকি করেছেন। সোস্যুরীয় সিগনিফায়েড/সিগনিফায়ার দ্বিত্ব নিয়ে দেরিদার বহু সমালোচনা থাকতে পারে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। কিন্তু সেই সমালোচনার বর্শাফলক হল এই যে সিগনিফায়ার-নিরপেক্ষ সিগনিফায়েড থাকতে পারে না। অর্থাৎ সাধারণ-ভাবে 'ভাব' বা 'চিন্তা'—নিরালম্ব, ভাষাবিহীন থাকতে পারে না। এর অর্থ, সিগনিফায়ার-সিগনি-ফায়েড কোথাও একটা মিলে যাবে, কোনো এক পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে—এরকম কোনও ট্রান্সে-ডেনটাল, লোগোসেনট্রিক পশ্যন্তী-বাক্ নয়, যা ভর্তৃ-হরির। যদি এভাবে বলাটা রুচিবিগর্হিত না হয়, তবে বলব যে ভর্তৃহরি ভাষাকে টেনে পশ্যন্তী-বাক্ এ তুলতে চান আর দেরিদা সেটাকে টেনে বৈখরী-বাক্ এ নামাতে চান। আর মতিলাল? তিনি শুধুই ভুল বোঝেন। যদি ভর্তৃহরি (ওপরে যা দেখলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে) লোগোসেনট্রিক না হন, যদি তাঁর তত্ত্ব লোগোসেনট্রিজম না হয়, তবে লোগোসেনট্রিজম কী?

অপরপক্ষে, সোস্যুরের লঙ্গ/পারোল দ্বিত্বর ভিত্তি হল নিছক বৈজ্ঞানিক বিমূর্তকরণ, যেটা heuristic। এর মধ্যে কোনো ব্রহ্ম-ট্রহ্ম লুকিয়ে নেই। জানাচ্ছেন বার্ত :

'Language and speech : each of these two terms···achieves its full definition only in the dialectical process which unites one to the other : there is no language without speech (ভর্তৃহরির ক্ষেত্রে এটা বলা যেত না), and no speech outside language : it is in this exchange that real linguistic praxis is situated, ...Language and speech are therefore in a relationship of reciprocal comprehensiveness. ...since it (অর্থাৎ language) is a collective summa of individual imprints, it must remain incomplete at the level of each isolated individual : a language does not exist perfectly except in the 'speaking mass'; one cannot handle speech except by drawing on the language. But conversely, a language is possible only starting from speech (ভর্তৃহরির ক্ষেত্রে এটা উল্টো হত) : historically speech phenomenon precede language phenomenon (it is speech which makes language evolve), and genetically, a language is constituted in the individual through his learning from the enviornmental speech.... To sum, a language is at the same time the product and instrument of speech : their relation is therefore a genuinely dialectical one. It will be noticed ...that there could not possibly be (at least according to Saussure) a linguistics of speech, since any speech, as soon as it is grasped as a process of communication, is already a part of language : the latter can only be the object of science.'[৮]

বোঝা যাবে যে ভর্তৃহরির সঙ্গে সোস্যুরের পার্থক্য নজর কাড়ার মতো।

মতিলালের দুর্বলতম অংশটি হল বইটির একাদশ অধ্যায়—Translation and Bhartrhari's concept of language (S´abda)। এটিকেই এক স্বতন্ত্র নিবন্ধের আকারে পড়া হয়েছিল প্যারিসে দেরিদার সংগঠিত সেমিনারে। যাই হোক, পড়েই বোঝা যাচ্ছে যে প্রবন্ধটি চেষ্টা করে ফাঁদা। কনফারেন্স-এর বিষয়বস্তু ছিল—Translation, Transference and Transformation, অতএব ভর্তৃহরির অনুবাদ বিষয়ে কিছুই না বলার থাকা সত্ত্বেও মতিলাল ফেঁদে বসলেন একটি নাতিদীর্ঘ পেপার। এটা লক্ষণীয় যে সুবিপুল সংস্কৃত সন্দর্ভগুলিতে—ব্যাকরণ, দর্শন, অলঙ্কার বা সমালোচনাতত্ত্বে—কোথাও অনুবাদের কথাটা মাত্র নেই। এই অনুপস্থিতিকে মতিলাল প্রশ্ন করতে পারতেন। এই অনুপস্থিতি এক অর্থে লোগোসেন্ট্রিজমের দ্যোতক। ভাবখানা যেন ঈশ্বর সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন—দেবভাষা সংস্কৃত। অতএব অনুবাদ অচিন্তনীয়, প্রশ্নই ওঠে না।[৯] যাই হোক, প্রবন্ধটিতে মতিলাল বলে বসলেন যে যদিচ সোস্যুর-উদ্ভাবিত সিগনিফায়ার / সিগনিফায়েড দ্বিত্ব মাততুতো ভাই হল ভর্তৃহরির বাক্-অর্থ, তদাপি সোস্যুর তথা পশ্চিমী চিন্তনে সাধারণভাবে যে ভাষানিরপেক্ষ একটি বিশুদ্ধ সিগনিফায়েড খোঁজার চেষ্টা হয়েছে (দেরিদার 'ট্রান্সেনডেনটাল সিগনিফায়েড'), ভর্তৃহরির মধ্যে সে কলঙ্কের রেশমাত্র নেই। এরপর, ভর্তৃহরি নিয়ে খানিক আবোল-তাবোল কথাবার্তা। তারপর, সহসা প্রবন্ধের অন্তে এসে মতিলাল ঘোষণা করলেন যে যেহেতু ভর্তৃহরি মুখের ভাষাকে লেখার ওপর প্রাধান্য (primacy) দেন নি, অতএব লোগোসেন্ট্রিজমের আদিপাপের রেশমাত্র নেই তাঁর দর্শনে। এই অসামান্য বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি মাত্র দেড় পাতা নিলেন।

ভর্তৃহরির দিকে যাওয়ার ভূমিকা হিসাবে সিগনিফায়ার-সিগনিফায়েড দ্বিত্ব ও সাধারণভাবে সোস্যুরীয় চিহ্নের ধারণার সীমাবদ্ধতা নিয়ে খানিক কথা বলি। মতিলালের সোস্যুরকে লোগোসেনট্রিজমের ধারকবাহক বানানোটা তাঁর অজ্ঞতার পরিচায়ক, সোস্যুরকে পশ্চিমের দার্শনিক ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বান্দ্বিকভাবে না বুঝতে পারার ফলাফল।[১০] মনে রাখি যে, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই সোস্যুর প্রথম বলেছিলেন যে সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েড এক অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য একক। সচেতনভাবে তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে, 'এই দ্বি-মাত্রিক ঐক্যকে প্রায়ই মানুষের শরীর ও আত্মার ঐক্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই তুলনা মোটেও গ্রাহ্য নয়।' সোস্যুরই প্রথম, "ভাষা" থেকে শাব্দিক উচ্চারণকে বহিষ্কৃত করে, এটা দেখিয়ে দেন যে সিগনিফায়ারের প্রকৃতি মোটেও শাব্দিক নয়, ভাষাতত্ত্বকে সাধারণভাবে সেমিওলজির অংশ হিসাবে গণ্য করে, চিহ্নের ধারণাকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করলেন যার সঙ্গে চিহ্নের পুরোনো ঐতিহ্যানুসারী ধারণাকে কোনোভাবেই আর মেলানো যাবে না।

আবার, সিগনাস (signas) ও সিগনেটাম (signatum)-এর মধ্যে এক 'এসেনসিয়াল' দ্বিত্ব ঢুকিয়ে এবং পরে সিগনেটাম-এর সঙ্গে 'ধারণা'র (concept) সমীকরণ করে,[১১] সোস্যুরই একটি 'ধারণা'-কে স্ব-মধ্যে ও স্ব-সম্পর্কে ভাবার প্রতিক্রিয়াশীল রাস্তাটি খুলে দিলেন। সোস্যুরীয় বিপ্লবের এই দুটি দিককেই একই সঙ্গে ও সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন না করলে সোস্যুরকে ভুল বোঝা হবে।

যা বলছিলাম। ভর্তৃহরির সঙ্গে সোস্যুরের তুলনাটা খুবই জোলো—তানসেনের সঙ্গে বাথ্-এর তুলনার মতো। একেবারেই জমে নি। লঙ্গ / পারোলের সঙ্গে স্ফোট / নাদ-এর তুলনার অপ্রতিসমতা নিয়ে আগেই বলেছি। এবার সিগনিফায়ার / সিগনিফায়েড। এক্ষেত্রে মতিলালের ভ্রান্তি সহজেই দেখানো যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ১২২ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে সিগনিফায়ার / সিগনিফায়েড দ্বিত্বকে বাক্ / অর্থ দ্বিত্বের সঙ্গে তুল্যমূল্য বলা হল। ১২৩ পৃষ্ঠার নবম ও দশম পংক্তিতে সেটা আবার পালটে গিয়ে হল, বাচক = সিগনিফায়ার ও বাচ্য = সিগনিফায়েড। ১২৪ পৃষ্ঠায় স্বীকার করা হল 'I use 'signifier / signified which is the terminology of modern linguists (সেক্ষেত্রে মডার্ন লিঙ্গুইস্টদের মধ্যে চমস্কি বাদ পড়ে যাচ্ছেন। মতিলাল খেয়ালও করলেন না), for the Sanskrit 'vācaka – vācya'. Despite obvious similarity, it is not fare to conflate the two terminologies and I am not attempting to compare or identify them.' (তবে এতক্ষণ উলটো বক্তৃতা করছিলেন কেন?)। আবার বলা হল, '...in Sanskrit we (এই 'we' কে বা কারা?) talk about only one word-object relation : vācya-vācaka-bhāva. These may simply be very distant *resonance* (sic) here of the rather technical use of the signifier-signified distinction of the Western Linguists'. (পৃ 124)

মতিলালের বয়ানেই, তথাকথিত শব্দ ও বিষয় যুক্তকারী সম্পর্কটির স্থানাঙ্ক হল বাচ্য-বাচক-ভাব। ভাবে কথাটা এখানে এত জোরের সঙ্গে বলা হল (সেটা মতিলাল না ভর্তৃহরি, কে বললেন, সেটা ঠিক বোঝা গেল না) যে এর পর মতিলালের ভর্তৃহরি প্রকল্পে ট্রান্সেনডেনটাল সিগনিকফায়েডের কোনো জায়গা নেই এটা বলাটা আত্ম-বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। এহ বাহ্য। ১২৫ পৃষ্ঠায় মতিলাল বলছেন :

'An absolute beginning of language is untenable. Language is continuous and co-terminus with the human···being. ...the Naiyāyikas, ...held that language is an arbitrary and conventional tool, and hence the word-object-relationship is created by and learnt through convention for there does not exist any real connection between the word 'cow' and the object cow. According to Bhartṛahari, language is underived and the word-thought relation is given to us ; it is eternal .... We may quote Jacques Derrida's epigram : 'Everything begins

by referring back, that is to say, does not begin.'

নিছক দেরিদা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই যদি সমস্ত সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত, তবে মন্দ হত না। এটা সত্য যে ভাষার উৎপত্তি ও আদি নিয়ে পশ্চিমে যেসব গালগল্প চালু আছে, দেরিদা "দ্য লা গ্রামাতোলজি" কেতাবে সেসবের অসারতা তন্নন্ন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু দেরিদা কখনও বলবেন না যে ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন কাকতালীয় নয় বা ভাষা চিরন্তন (eternal)। ভাষা চিরন্তন কিভাবে হবে? মানুষের আগে ভাষা থাকতে পারে না (কারা সেই ভাষায় কথা বলত?)। থাকত বলার অর্থ হল সেই থিওলজিতে ফিরে যাওয়া: শুরুতে ছিল শব্দ। ভর্তৃহরি সেটাই করেন, একটু অন্যভাবে। শব্দ ও চিন্তার (word-thought) সম্পর্ক আমাদের কাছে 'given' হতে পারে, কারণ চাইলেই আপনি-আমি সেটা পালটাতে পারি না। কিন্তু সেটা কাকতালীয় ছাড়া আর কী হতে পারে? 'গোরু' শব্দের সঙ্গে গোরুর ধারণার কোনো ইনট্রিনসিক যোগাযোগ থাকার কথা বলার অর্থই হল সোস্যুরের সমস্ত অবদান স্বেচ্ছায় ফেলে দেওয়া। ভাষা 'underived'ও হতে পারে—তাইই—কারণ ভাষার পেছনে বা আগে যাওয়া যাবে না। যেতে হলে ভাষা দিয়েই যেতে হবে, সেটা অসম্ভব। কিন্তু কোনোভাবেই ভাষা ও চিন্তনের সম্পর্ক চিরন্তন নয়। সেটা ক্রমাগত, প্রতিমুহূর্তে পালটাচ্ছে। ভাষার ইতিহাস দেখলেই সেটা দেখা যাবে।[১২]

এবার আসি মতিলালের ভর্তৃহরি নাটকের শেষ অঙ্কে। ১৩১ পৃষ্ঠায় মতিলাল জানাচ্ছেন:

'Anybody familiar with J. Derrida's writing ...knows the...view which regards logocentrism (particularly the centrality of speech or the sonic element of language) as a bias which has supressed free thinking about language and retarded our reflection on the origin and status of writing and its proper place in our study of language.' খানিক পরে, 'In spite of Bhartrhari's explicit use of s'abda and speech, I would argue that he was not guilty of 'logocentrism' in Derrida's sense.'

মতিলালের বর্ণনে, যেহেতু ভর্তৃহরি লেখার ওপর মুখের ভাষার প্রাধান্য নিয়ে কিছু বলেন নি (যেমনটা বলেছেন প্লেটো, আরিস্তল, একুয়ানিয়াস, অগাস্টাইন, হামবোলট, হার্ডার, হেগেল, হুসারল, রুসো, সোস্যুর ইত্যাদিরা) অতএব তিনি লোগোসেনট্রিজমের আদিপাপে পাপী নন।

মতিলালের সমস্যা হল যে তিনি এটা বোঝেন না যে, লোগোসেনট্রিজম্ ও ফোনোসেনট্রিজম্ সমার্থক নয়। পরেরটি প্রথমটির অংশ, প্রথমটির ব্যাপ্তি পরেরটির থেকে অনেক বেশি। দেরিদা বলছেন,

'logocentrism is a wider concept than idealism, for which it serves as a kind of overflowing foundation. And a wider concept than phonocentrism too... . The handling of the concept of logocentrism, therefore, is delicate and sometimes troubling.'[১৩]

কতটা 'ডেলিকেট' সেটা বোঝা যাচ্ছে যখন দেরিদা একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হল:

'Can there be a surpassing of this metaphysics? Can a graphocentrism be opposed to a logocentrism? Can there be an effective transgression of closure, and what then would be the conditions for a transgressive discourse?'

দেরিদার উত্তর:

'There is not a transgression, if, one understands by that a pure and simple landing into a beyond of metaphysics, at a point which also would be, let us not forget, first of all a point of language or writing. Now, even in aggressions or transgressions, we are consorting with a code to which metaphysics is tied irreducibly, such that every transgressive gesture reincloses us—precisely by giving us a hold on the closure of metaphysics—within this closure.' 'This is why it has never been a question of opposing a graphocentrism to a logocentrism, nor, in general, any center to any other center. 'Of Grammatology' is not a defense and illustration of grammatology. And even less a rehabilitation of what has always been called writing It is not a question of returning to writing its rights, its superiority or dignity... nothing would be more ridiculously mystifying than such an ethical or axiological reversal..... . 'Of Grammatology' is the title of a question: a question about the necessity of the science of writing, about the conditions that would make it possible,..... ; but it is also a question about the limits of this science.'[১৪]

বস্তুতপক্ষে, এত কথা বলার কোনো দরকার ছিল না। ভারতীয় ঐতিহ্যে মুখের ভাষা বনাম লেখার বোকা মারামারিটা না থাকার কারণ অতি সহজ। এজন্য কোনো দার্শনিক ভাষ্যও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। যে-কোনো কারণেই হোক (ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আবহাওয়াসংক্রান্ত বা নিছক মানসিকতাজাত কিংবা ফুকো যাকে বলবেন 'আর্কিওলজিক্যাল') পরম্পরাগত সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় লেখা ব্যাপারটা প্রাধান্য পায় নি। সংস্কৃত ভাষার কোনো লিপি ছিল না, আজও নেই। ফলে লেখাকে বিশেষভাবে হেয় করে কোনো মতাদর্শের ধারাও গড়ে ওঠে নি। মাথাই নেই, তার মাথাব্যথা।

কিন্তু ফোনোসেনট্রিজম্ যথেষ্ট ছিল, যদিচ সেটাকে লেখার বিরোধিতায় রাখার প্রয়োজন হয় নি। ফোনোসেনট্রিজম ছিল, কারণ পরম্পরাগত জ্ঞানচর্চায় 'শ্রুতি'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। সঠিক উচ্চারণের উপর মন্ত্রপাঠে সঠিক স্থানে শ্বাসাঘাতের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হত। সম্ভবত ধ্রুপদী ভারতীয় সভ্যতাই বিশ্বের একমাত্র প্রাচীন সভ্যতা যেখানে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের জ্ঞানসংবাহনে 'শ্রুতি' এত বিরাট ভূমিকা নিত। মিশরে প্যাপিরাস ছিল, বেবিলনে পোড়া টালি ছিল, গ্রীসে পাথর ছিল, চীনে কাগজ ছিল। আমাদের ছিল নিছক কান ও জিহ্বা। শুধু তাই নয়। লেখার টেকনোলজি যবে থেকে সহজেই প্রাপ্য ছিল, তখনও আমরা লেখার ওপর এত গুরুত্ব দিই নি—বিশেষত বিমূর্ত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, যদি ধ্রুপদী ভারতীয় সভ্যতার একটি অন্যতম চরিত্রের কথা আমাকে বলতে বলা হয়, তবে তা নিশ্চয়ই হবে লেখার ওপর মুখের ভাষা ও 'অথরাইজড' উচ্চারণের অ্যাবসোলিউট, এপিস্টেমিক প্রায়রিটি। অন্যান্য সভ্যতার ডিসকোর্সে লেখার তবু স্বীকৃতি আছে, এখানে তা নিয়ে কোনো প্রসঙ্গও উত্থাপন করা হয় নি। ধ্রুপদী ভারতীয় সভ্যতা সম্ভবত একমাত্র সভ্যতা যেখানে সঠিক উচ্চারণে উচ্চবর্ণের উচ্চারিত বাক্যের সত্যমূল্যকে দার্শনিকরা দার্শনিক 'সত্য' বলে স্বীকার করেন। ফোনোসেনট্রিজম্ তথা লোগোসেনট্রিজমকে এর থেকে বেশি দূরে আর নিয়ে যাওয়া যায় না। ইউরোপ এ বিষয়ে আমাদের কাছে নিতান্ত শিশু।

মতিলালের বইটি তাঁর জীবদ্দশাতেই আমাকে আলোচনা করতে দেওয়া হয়েছিল। আমার সাধ্যমতো এই দায় আমি বহন করেছি।

সূত্রনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য: চার্লস টেলর, ফিলজফিকাল পেপার্স I, পৃ ২১৭, কেমব্রিজ, ১৯৮৬।

২. দ্রষ্টব্য: উমবেরতো একো, সেমিওটিক্স অ্যানড দি ফিলজফি অব ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃ ১০২, লনডন ১৯৮৬।

৩. দ্রষ্টব্য: জাক্ দেরিদা, পোজিসনস্, পৃ ৭, অনুবাদক —আলা বাস, শিকাগো, ১৯৮১।

৪. ফ্রিদরিশ্‌ নীৎশে—ট্রুথ আনড ফলসিটি ইন দেয়ার এক্সট্রামরাল সেন্স।

৫. দ্রষ্টব্য : ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, কোর্স ইন জেনারেল লিঙ্গুইস্টিকস্‌, পৃ ১৪, ১৭, ৭৭, ১৬৫। সম্পাদনা—শার্ল বালি ও আলবের শয়াই। অনুবাদ—ওয়েড বাস্কিন। ফনটানা / কলিনস্‌, লনডন, ১৯৮১।

৬. রোলাঁ বার্ত, এলিমেনটস অব সেমিওলজি, পৃ ১৩, ১৩। অনুবাদ—আনেৎ লাভে ও কলিন স্মিথ। লনডন, ১৯৬৭।

৭. বাক্য-পদীয় (১), পৃ ১, সম্পাদনা / অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, কলকাতা।

৮. এলিমেনটস অব সেমিওলজি, প্রাগুক্ত।

৯. গ্রীক ভাষার originary ভূমিকা নিয়ে ও গ্রীক দর্শনে তার প্রভাব নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কাজ করেছেন পিয়ের ভাবনা। দ্রষ্টব্য : The Origin of Greek Thought, লনডন, ১৯৮০।

১০. সোস্যুরীয় চিহ্নতত্ত্বের প্রায় তার সমকালীন সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : ভি. এন. ভোলোসিনভ —'মার্কসিজম্‌ অ্যানড দি ফিলজফি অব ল্যাঙ্গুয়েজ' বইয়ের পাঠ—২-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ৬৫-১০৬। অনুবাদ : লাদিস্লাভ মাজেকা ও আই. টিটুনিক। হারভার্ড, ম্যাসাচুসেটস্‌, ১৯৭৬। এবং জুলিয়া ক্রিস্তেভা—সেমিওটিক্স : 'এ ক্রিটিকাল সায়েন্স অ্যানড / অব এ ক্রিটিক অব সায়েন্স'। 'দি ক্রিস্তেভা রিডার', সম্পাদনা—টোরিল মোয়া, পৃ ৭৪-৮৮, অক্সফোর্ড, ১৯০৯।

১১. ফ. সোস্যুর, প্রাগুক্ত, পার্ট-২, ৫. সিনট্যাগম্যাটিক ও অ্যাসোসিয়েটিভ রিলেশনস্‌, পৃ ১২২-২৭; ৬. মেকানিজম্‌ অব ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃ ১২৭-৩১।

১২. ভোলোসিনভ, প্রাগুক্ত, পার্ট-৩. টুওয়ার্ড এ হিস্ট্রী অব ফর্মস অব আটারেন্স ইন ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্ট্রাকশন্‌। ও সোস্যুর, প্রাগুক্ত, পার্ট-৩. ডায়াক্রমিক লিঙ্গুইস্টিকস্‌।

১৩. জাক দেরিদা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।

১৪. জাক দেরিদা, 'পোজিসনস্‌', প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৩।

মুদ্রণপ্রমাদ

গৌরী আইয়ুব-রচিত "রবীন্দ্র-গবেষণার একটি অভিনব ধারা" প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে (জুন সংখ্যায়) কয়েকটি শব্দের মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে :

পৃষ্ঠা	কলম	লাইন	শুদ্ধ পাঠ
১১২	২	শেষ	ইমানসিপেসিয়ন
১১৩	১	২১	পূর্ণ
		২৫	বাচরুবীর
১১৫	২	৬	ঘটনাচক্রে
১১৬	১	১৩	ইমানসিপেটেড
	২	১৪	অতএব
১১৮	১	১৮	মিকা

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

অনুপস্থিত মহাকাব্যের ছায়া : দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও বাঙলা কথাসাহিত্য

অচিন্ত্য বিশ্বাস

একজন সমালোচক অভিযোগ করেছেন বাঙালি কথাসাহিত্যিকরা দাঙ্গা ও দেশবিভাগ নিয়ে বিশেষ কিছু লেখেন নি।

'বাঘা-বাঘা জাতীয়তাবাদী, মানবতাবাদী, জীবনবাদী সাহিত্যিক, যাঁরা নিজেদের বাঙলা সাহিত্যের বলিষ্ঠ লেখক বলে দাবি করেন, মনে করেন যে তাঁদের জন্যেই বাঙলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পাতে রাখা যাচ্ছে, তাঁদের চোখের ওপর দিয়েই · এদেশ থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল মনুষ্যত্ব, শেয়ালদা-সহ পশ্চিমবঙ্গের ছোটোবড়ো রেল স্টেশনগুলোতে ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে—গোটা ভারতে—বিংশ শতকীয় সভ্য মানুষ আদিম মানুষে পরিণত হয়ে গেল। অথচ, তারাশঙ্কর-বনফুল-বুদ্ধদেব বসুরা এবং স্বাধীনতা-পূর্ব কালের ছোটো-বড়ো লেখকেরা তা নিয়ে কোনো মেজর লেখাতেই হাত দিলেন না। যাও বা ছিটেফোঁটা লেখা হয়েছে তাও যৌন-মাত্র-পুঁজি অসহায় উদ্বাস্তু মেয়েদের তবিল তছরূপ করার জোলো রিরংসা ছাড়া কিছু নয়।·· স্মরণাতীত কালের মধ্যে ভারতে এত বড়ো নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটেছে বলে ইতিহাসের সাক্ষ্য নেই। বিদেশে এমনটি ঘটলে কোনো সৎ লেখক তা কোনোদিন এড়িয়ে গেছেন বলেও শোনা যায় নি, সেখানে অন্তত পাঁচ-সাতখানা দুরন্ত উপন্যাস কি ছোটো বড়ো গল্প লেখা হতই।'[১]

শুধু উপন্যাস-সাহিত্য কেন, ইদানীং একজন প্রাবন্ধিক লক্ষ করেছেন—দেশভাগ নিয়ে 'এমন কি প্রবন্ধ'ও তেমন লেখা হয় নি। তাঁর সিদ্ধান্তও অনুরূপ—'দাঙ্গা ও দেশবিভাগ বাঙালি সাহিত্যিকদের তেমন বিচলিত করে নি আদৌ।'[২]

আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সত্যি অবাক হয়েছি। উপন্যাসের আধুনিকতা নিয়ে, চেতনা-প্রবাহ-মূলকতা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা হয়েছে—উপন্যাসে রীতিপ্রকৃতির অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে; কিন্তু বাঙালি জাতির জীবনে এত বড়ো ভয়ঙ্কর ও সুদূরপ্রভাবী ঘটনা নিয়ে সৃজনশীল সাহিত্যিক খুঁজে পেলেন না সাহিত্যের বিষয় আর মননশীল সাহিত্যিকরা খুঁজে পেলেন না কোনো তাৎপর্য! রাজনীতিকে কি আমাদের প্রাবন্ধিকরা এড়াতে চান, ঔপন্যাসিকরা? মোটেই নয়। রাজনৈতিক উপন্যাস অনেক লেখা হয়েছে, উপন্যাসের রাজনীতি নিয়ে ছাপা হয়েছে আরও অনেক ফর্মা কাগজ—হয় নি আমাদের দেশের রাজনীতির সবচেয়ে প্রভাবশীল ঘটনার কথা, যা দেশটিকে বদলে দিয়েছে—ভূগোল বদলে গেছে; ইতিহাস আর সংস্কৃতি সবই বদলে গেছে যার ফলে।

কেন এমন হল? এ নিয়ে কোনো অনুমানই অভ্রান্ত হবে না। সকলের দায়বোধ সব সময় কাজ করে না। জয়নুল আবেদিন আর সোমনাথ হোড় দুর্ভিক্ষ আর তেভাগা নিয়ে ছবি আঁকেন, ঋত্বিক ঘটক যে দায়বোধ আর অস্তিত্ব-নিঙড়ানো বেদনা ঝরাতে-ঝরাতে নির্মাণ

লেখক অচিন্ত্য বিশ্বাস উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

করেন চলচ্চিত্র, কেন সেই দায়বোধ বাঙালি কথা-সাহিত্যিকরা প্রকাশ করলেন না?

অবশ্য আমরা পূর্বজদের উপরে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়েই তৃপ্ত নই। সব জাতির প্রবণতা ঠিক একভাবে কাজ করে না। বাঙলার সমাজের যে অংশ উপন্যাস পড়ে, তাদের হয়তো দাঙ্গা ও দেশবিভাগ তেমন চঞ্চল করে নি। হতে পারে তাদের একটি বড়ো অংশ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন দেশবিভাগ আর দাঙ্গা শুরু হবার আগেই। কলকাতার বাইরের বৃত্তে তাঁদের জবরদখল কলোনিগুলি গঠনের ইতিহাস কি তেমনি কোনো সত্যের সন্ধান দেয়? তিরিশের দশকে বাড়ি ছেড়ে যাঁরা মেসে থেকে শিক্ষা আর চাকরির ব্যবস্থা করেছেন—যেমন আমরা শরৎ-পরবর্তী বাঙলা উপন্যাসে হামেশাই দেখেছি—তাঁদের যদি বলা হয় ব্যবস্থাটি একটু পালটে নিন; এবার থেকে কলকাতার দূরবর্তী অঞ্চলে থাকুন। আর গ্রামের জমির অধিকার এবার থেকে শেষ, তাহলে তা নিশ্চয় উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়। কিন্তু দলে-দলে ছিন্নমূল মানুষদের ভয়ার্ত পলায়নপর চিত্রে যে বিস্তৃতি খেয়াল করি—যে ধ্রুপদী শিল্পকলার রুদ্র-করুণ ঝঙ্কারের সম্ভাবনা, ঠিক যেমনটি আমরা বিদেশী যুদ্ধোপন্যাস, ফরাসি বা রুশ বিপ্লবের উপর রচিত উপন্যাসগুলিতে দেখি, তার সঙ্গে উক্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তুর খুব সম্পর্ক থাকে না। এজন্যই কি দাঙ্গা আর দেশবিভাগের ওপর নির্ভর করে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের কাম্য-ক্লাসিকের জন্ম হল না? কেন আমাদের সমাজে উপন্যাস খুঁজে আনে সেই বাস্তবতা যা প্রধানত হিমশৈলের চূড়া-টুকুতেই আলো ফেলে? হতে পারে আমাদের ওই অংশটুকুই আলোকিত, বাকিটুকু নয়। বাকি অংশটির জন্য নানা সময় নানা শ্লোগান লেখা হয়। শুধু তাই। লেখা হয় 'টিপসই আর নয়।' বাস্তবে টিপসই-ভরসা যারা, তারা কিভাবে এসব পড়বে? লেখা থাকে 'নিরক্ষরতার লজ্জা দূর হোক'; নিরক্ষর রাখার ব্যবস্থা যদি লজ্জা না পায়, নিরক্ষর কেন লজ্জা পাবে?

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিতে বাঙলার উপন্যাস গড়ে ওঠে জমিদারের দুঃখকে ঘিরে ("আনন্দমঠ"); অসহযোগ আন্দোলন ও অনুরূপ কিছু ঘটনার উপর লেখা হয় আর-একটি উপন্যাস ("ধাত্রীদেবতা")—সেখানেও একজন জমিদারের চোখে দেখা আবেগী-বিবেকী মানসিক অভিঘাত। দেশবিভাগে যত জ্বালা আর বেদনা, তা-ও আমরা লক্ষ করেছি একই রকম এলিটের চোখ দিয়ে। যাঁদের কষ্টের প্রধান কারণ জমিদারি চলে গেল! যাঁদের দুঃখের অজুহাত—ভূমিবান্ ও ভূমিহীনদের মধ্যে অভিপ্রেত-সম্পর্কে চিড় ধরল! দুটি মাত্র উদাহরণ দিই। আমরা যে দুটি উপন্যাসিককে অবলম্বন করেছি সেখান থেকেই দিই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে এক অভিজাত ভদ্রলোক—যিনি বিদ্যা আর বিত্তে কুলীন—রামকৃষ্ণ ঘোষ, বলেছেন:

'পূর্ববঙ্গে আমি অনেকদিন ছিলাম। দেখেছি কী আশ্চর্য দেশ—কত প্রাচুর্য, কত সমৃদ্ধি! তাছাড়া সারা বাংলার ওইটেই ছিল ফাইটিং ফ্রন্ট। সুজলাং সুফলাং বললে ওই দেশটাকেই বোঝাত। আর আজ আমরা চিরকালের মত তা হারালাম'।[৩]

এ দুঃখ নিতান্তই জমিদারের দুঃখ। জ্যোতির্ময়ী দেবী দুজন মুসলমান ভূমিহীনের কথা লিখেছেন:

রহিম আর করিম। 'বাড়িতেই থাকে, অন্য গাঁয়ের লোক ওরা। বাড়িতে মার কাছে খায়। কলা-পাতা উল্টা করে পেতে বসে-বসে অনেক ভাত তরকারি মাছ খায়।'[৪]

দাঙ্গার দিন তারা নায়িকাদের বাড়িতে চড়াও হয়েছে। নায়িকার মা বলেছেন:

'তোরা এসেছিস? যা গরুগুলোকে খুলে দিয়ে আয়। মনে হচ্ছে আগুন এদিকে এসে পড়েছে। ওরা দাঁত বের করে হাসতে লাগল। একজন বললে, "আচ্ছা"। কিন্তু কেউ নড়ল না।'[৫]

এইভাবে দেখলে ভূমিবান্ ও ভূমিহীনদের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসকে আমরা অন্যভাবেও বিচার করার যুক্তি পাই। দাঙ্গা হয়ত তার নিষ্ঠুর উলঙ্গ প্রকাশ, কিছুটা দিশাহীনও।

ইতিহাসের সেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতির ছায়ার আড়ালে যেসব মুখ খেলে গেছে তাদের সকলেই যে যথার্থ আবিষ্কৃত তা নয়; যতটুকু তথ্য পাচ্ছি তার ভিত্তিতে একথা বলায় বোধ করি কোনো ভুল নেই যে—১৯০৫ খ্রী যে বাঙালি ভূম্যধিকারীরা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরোধিতা করেন, ১৯৪৭ খ্রী সেই নেতৃত্বই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে সমর্থন করেন। ১৯৪৭ খ্রী ২৩ এপ্রিল তারিখে *Statesman* পত্রিকায় ভূমিহীন বাঙালি রায়তদের একজন প্রতিনিধির কণ্ঠে তাই শুনতে পাই বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা। স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ, একটু হয়তো সাহসীও। একটু শোনাই—

'He does not mind if the Hindu Mahasabha leader Dr. Shyama Prasad Mukherjee and his colleagues and few Western Bengal inhabitants support the move for partition, "but I am really astonished to find Mr. N. R. Sarkar, ...also supporting the move... . It also pains me to find that Mr. Kiran Shankar Ray, a Hindu Zamindar of Eastern Bengal, Rai Bahadur Satyendranath Das, M.L.A. (Central), also a Zamindar of Eastern Bengal, and Mr. A. M. Poddar M. L. A. (Central) a big merchant of Eastern Bengal have supported the partition proposal.'

শেষ পর্যন্ত মানুষটি তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন:

The creation of a West Bengal province will only reduce the area of Bengal and make the border line narrow... . I have no doubt in my mind that if such an eventuality happens, the Hindu of Eastern Bengal will have no other alternative than to take shelter in Western Bengal'.

বলা প্রয়োজন, এই সাংবাদিক সম্মেলনে যিনি মত প্রকাশ করেন তাঁর নাম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বাঙলার দলিত পশ্চাৎপদদের চোখে যিনি 'মহাপ্রাণ' হিসাবে বিবেচিত। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে মণ্ডলের সত্যভাষণ আর-একটু শোনাই—

'I want to make it quite clear that the scheduled castes are opposed to the proposal for the partition of Bengal'.[৬]

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে তাবড়-তাবড় জমিদার আর ব্যবসায়ীরা সেদিন দেশবিভাগকে সমর্থন করেছেন। আমরা সামান্য আন্দাজ করতে পারি কারণটি। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ খ্রী কার্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় থেকেই বাঙলার ভূমিবান্ মানুষরা বুঝে যান দেশের পূর্বাংশের ভূমিকেন্দ্রিক আর্থিক-ব্যবস্থার পরিবর্তন আসন্ন। ক্ষমতায় যাঁদেরই কুলিয়েছে, তাঁরাই তাই সরে এসেছেন শিল্পায়নের দিকে। ১৯৭০ সাল নাগাদ একটি তথ্য-সন্ধানের ফল দেখতে পাচ্ছি, বাঙলার শিল্পপতিরা প্রায় সকলেই এসেছেন জমিদার বর্গ থেকে। ভাগ্য-কুলের জমিদার রায়-রাই হোন আর লাভপুরের জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়রাই হোন—বাঙলার নবোদিত শিল্পপতিরা যে উচ্চবর্ণের জমিদারশ্রেণী থেকে আগত, একথা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞতা দরকার হয় কি? ১৯০৬ খ্রী 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল'-এর কথাই ধরি। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আর ভাগ্যকুলের জমিদার সীতানাথ রায়ের ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে প্রধান।[৭] ইনচেক টায়ার-এর দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায়দের কথাই বলি আর বেঙ্গল ল্যাম্পের সুরেন্দ্রকুমার রায়, কিরণ রায় কিংবা নৃপেন মজুমদারের কথাই ধরি—সত্যটি পালটায় না। অন্য-দিকে ১৯৫২ সালের অকটোবর মাস থেকে ঢাকার ভিসা অফিসটির কথা স্মরণ করুন। ১৯৫৫ সালে এই অফিসটির আধিকারিক শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেনগুপ্ত জানালেন—এত বড়ো ভিসা অফিস তখন পৃথিবীতেই

নেই! তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন কারা ভিসা চাইছেন? উত্তরে শ্রী সেনগুপ্ত যা বলেন, তা শোনাই:

'ভিসা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে বাস্তুত্যাগের প্রথম পর্যায়ে বর্ণহিন্দুগণ ভারতে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রধানত তপশীলভুক্ত জাতির লোকগণ বাস্তুত্যাগ করিতেছে। ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলা হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সাংখ্যক লোক বাস্তুত্যাগ করিয়াছে।

'শ্রীহট্ট, ঢাকা ও খুলনা জেলা হইতেও যথেষ্টসংখ্যক লোক বাস্তু ত্যাগ করিতেছে।'[৮]

সুতরাং উদ্বাস্তুসমস্যার দুটি স্তর স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ করি। প্রথম স্তরে যারা ভিসা প্রবর্তিত হবার আগেই চলে আসে, তাদের কথাই আমাদের কথা-সাহিত্যে প্রধানত স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ও বৃহত্তর অংশটির কথা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আজও অস্পৃশ্য থেকে গেছে। অথচ ট্রাজেডি তো তাদেরই বেশি যারা দেশ-বিভাগ চায় নি কিন্তু দেশবিভাগের খাঁড়াটি যাদের পরে আঘাত হেনেছে সবচেয়ে বেশি। এই বিষাদঘন পরিণতির কথা বাঙলা কথাসাহিত্যের আয়নায় সুস্পষ্ট রেখাচিহ্ন আঁকে নি।

আর-একটি প্রসঙ্গের কথা স্মরণ করতে পারি। যেমনভাবেই দেখি, দাঙ্গা আর দেশবিভাগের অনেক আগে থেকেই আমাদের সমাজমন খাড়াখাড়িভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একপাশে ছিল হিন্দু বাঙালি, অন্যপাশে মুসলমান বাঙালি। বেশ দীর্ঘদিন ধরে বাঙলা উপন্যাসে মুসলমানদের বাঙালি বলেই উল্লেখ করা হয় নি। হিন্দু বাঙালির মধ্যেও ছিল বিচিত্র আড়া-আড়ি বিভাজনরেখা। উদ্বাস্তু সমাজের দুটি স্তরের ইঙ্গিত করে এ বিষয়ে আলোচনা আগেই করেছি। এখন লিখি খাড়াখাড়ি বিভাজনটির কথা; রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন:

'আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত'।[৯]

লেখাটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে মুদ্রিত হয়। এর দুই যুগ পরে বাঙালি-মুসলমানরা দেশবিভাগের দাবি জানালেন। যাঁরা জমিদারি-কাছারিতে যুগ-যুগ ধরে জাজিম আর মেঝেতে উঠতে বসতে পৃথক হচ্ছিলেন তাঁরা যখন যথার্থ পৃথক হবার জন্য চেষ্টা করলেন তখন তাকে ইতিহাসের প্রতিশোধ বলে শনাক্ত করলে খুব কি দোষের হবে? আর-একবার স্মরণ করি রবীন্দ্র-নাথেরই একটি রচনাংশ:

'বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড, ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসল-মান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোন-দিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই। ...সংস্কৃত ভাষায় একটি কথা আছে ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ খননেরও চেষ্টা করি নাই—আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না, কেবল ধুলাই উঠিল, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপখননের কথা ভুলিয়া আছি। আরো বারবার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।'[১০]

আজ পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৩২১-এর ভাদ্র অবধি। ১৯১৪ খ্রী। পরবর্তী কালে, রবীন্দ্রনাথ যাকে কূপ-খননের প্রতীকে ধরেছেন, অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা, তা কি যথার্থ আন্তরিকভাবে হয়েছে? সামান্য দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া?

উপরের পটভূমিটি ভুলে গেলে বর্তমান আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে রচিত দুটি ছোটো-উপন্যাসকে আলোচনার সুবিধার জন্য বেছে নিচ্ছি। উপন্যাস দুটি এই—১. "বিদিশা": নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: আশ্বিন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ [১৯৫৪-৫৫ খ্রী]। ২. "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা": জ্যোতির্ময়ী দেবী; মার্চ ১৯৬৮ খ্রী। ["প্রবাসী" পত্রিকায় 'ইতিহাসে স্ত্রীপর্ব' নাম দিয়ে ১৯৬৭ খ্রী প্রকাশ পায়]

উপন্যাস দুটিই নায়িকা-প্রধান। "বিদিশা"র নায়িকা বিদিশা; তিন বোন। অন্য বোনরা হল বীণা আর বিনতি। বিদিশা মধ্যম। বীণা স্বামীহারা উন্মাদিনী। বিনতি সুন্দরী, আদুরে ছোটো বোন। বিদিশাই তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তিন-বোন পুরুষ-অভিভাবক-চ্যুত। ঢাকা থেকে তাদের পলায়ন-পর চিত্র এঁকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়:

'...মাটির রঙই বদলাল না, মানুষের মনের রঙও বদলে চলল দাঙ্গার পর দাঙ্গা—রাজনীতির কূট চক্রান্ত ছোরা হাতে নামল মানুষ মারার উন্মত্ত উল্লাসে। ঘৃণা অবিশ্বাসে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠল। তারও পরে এল স্বাধীনতার মূল্য—বাংলাদেশ দু টুকরো হয়ে গেল।'[১১]

সেই হুল্লোড়ের সময় তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিন বোন আর তাদের অভিভাবক বীণার স্বামী সুপ্রকাশ-বাবু খুন হলেন।

'একটা উন্মত্ত হত্যার স্রোত এসে আছড়ে পড়ল নিরীহ নিরপরাধ বিমান-যাত্রীদের ওপরে। বুকে পেটে চার-পাঁচটা ছোরার ঘা নিয়ে সুপ্রকাশ ঘাঁটির রক্তাক্ত ঘাসের ওপরে লুটিয়ে রইল, তার দিকে একবার ফিরে তাকানোর সময় পর্যন্ত পেল না তিন বোন।'[১২]

এর আগে বীণা ঢাকায় বিখ্যাত উকিল-স্বামীর কাছে থাকার সময় মুঙ্গেরের ভূমিকম্পে বিদিশা-বিনতি হারিয়েছিল তাদের বাবা-দাদাকে। তারপর—'কষ্টহারিণীর ঘাট থেকে, ভেসে-যাওয়া জীবনের দিগভ্রষ্ট ভেলা এসে আশ্রয় পেলো বুড়িগঙ্গার কূলে।'[১৩] "বিদিশা" উৎসর্গ করা হয়েছে চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রী অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। জানি না, চলচ্চিত্রায়ণের উদ্দেশ্যেই এ উপন্যাসটি রচিত কিনা। বাঙলা উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকাদের অনুরূপ একাকিত্ব লক্ষ করি। এটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু আমার মনে হয়েছে বাঙলা উপন্যাসের অনেক জায়গাতেই লেখকেরা পাত্র-পাত্রীদের আকস্মিকভাবে নিঃস্ব করে আনেন।

অন্য কোথাও কারণ যাই থাক, দেশবিভাগের অবকাশে বেশ কিছু গৃহচ্যুত মহিলাদের অসহায় পরিবেশ অত্যন্ত বাস্তব সত্য ছিল। "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা" উপন্যাসটিতেও লক্ষ করেছি বিদিশার মতো সংগ্রামী এক মহিলাকে—নাম সুতারা দত্ত। দাঙ্গায় তার বাবা-মা খুন হয়েছে—মা আত্মহত্যা করেছে। অবশ্য তার দাদারা বেঁচে ছিল। কিন্তু দাঙ্গার সময় সুতারার দাদারা ছিল কলকাতায়। সুতারা আশ্রয় পায় এক সহৃদয় মুসলমান পরিবারে। বেশ কিছু দিন পর অবস্থা শান্ত হলে ওই পরিবারের কর্তা তামিজুদ্দিন তথা 'কাকাসাহেব' সুতারাকে কলকাতায় দাদাদের কাছে রেখে গেলেও, ক্রমে সুতারা অনুভব করে সে দাদাদের পরিবারে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কারণ:

'এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়েছিল। এক আধদিনের জন্য নয়, ছ মাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়ে-মানুষের জাতজন্ম থাকে। তাকে এনেছিস বেশ করেছিস। তা একপাশে হাড়ী-বাগ্দীর মতো বসে দাঁড়িয়ে থাক তা না সব যজাতে, একাকার করতে বসল। কিছু আর বাকী রইল না। কিনা খেয়েছে। কি করেছে না করেছে কে তার খবর জানে।'[১৪]

সুতারা দত্ত নিজের দোষে বা ইচ্ছায় তামিজুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে থাকে নি। তা সত্ত্বেও তাকে এক-পাশে 'হাড়ী-বাগ্দীর মতো বসে দাঁড়িয়ে' থাকতে হল? গোটা উপন্যাসে এর কারণ সন্ধান করেছেন জ্যোতির্ময়ী

দেবী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও দেখিয়েছেন বিদিশারা তিন বোন আত্মীয়-স্বজন-পরিচিত-পরিজন কারো কাছেই সহজভাবে গৃহীত হয় নি। এর কারণ আমাদের সমাজতত্ত্বের গভীরেও সন্ধান করা সম্ভব। বরং সেটিই অধিকতর জরুরি। দেশবিভাজনের আগেও আমরা মুসলমান-সম্প্রদায়কে দেশের সমাজশরীরে সসম্মান অধিকার দিই নি; একটি অখণ্ড সমাজ হিসাবে আমরা গড়েই উঠি নি। দেশবিভাজনের পরও আমরা অনুরূপ চেষ্টা করি নি। দেশবিভাগের আগেও সুতারা দত্তের চোখে সমাজটি ছিল ছোটো-ছোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটু বিবরণ শোনাই। নোয়াখালির সেই গ্রামটিতে—

'বর্ণহিন্দু আরও কম। বেশির ভাগই মুসলমান চাষী, মজুর, তাঁতী, জোলা, গৃহস্থ। আর নমশূদ্র জেলে মালো মজুর শ্রমিকশ্রেণীর হিন্দু।'[১৫]

এই বিচ্ছিন্ন-বিশ্লিষ্ট সমাজ-শরীরের যে অংশ উচ্চস্তরে বাস করেন, তাঁরা যখন অন্তর্গত বিধি-বিধানের ফরমান দিয়ে নিজেদের লাঞ্ছিত অবমানিত নিপীড়িত অংশের প্রতিও দুর্ব্যবহার করেন, তখন সেই খণ্ডিত-জাতিসত্তার পক্ষে রাজনৈতিক পতন-অভ্যুদয়ের ঘটনাবলীকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা এবং উপন্যাসের সমস্যার অনুবাদ করা কি সম্ভব?

বিষয়টিকে একটু অন্যভাবেও দেখানো সম্ভব। অমূল্যবাবু—যাঁদের বাড়িতে সুতারার দাদারা স-পরিবারে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিল, তিনি সুতারার লাঞ্ছনা ভালোভাবে দেখেন নি। তাঁর জিজ্ঞাসা—

'আমরাও তো মুসলমানের দোকানের 'চাচা'র হোটেলের চপ-কাটলেট আনিয়ে খেয়েছি।'—উত্তরে অনুশাসনকারিণীর স্পষ্ট মত জানানো হল: 'সে তো তোমরা পুরুষ মানুষ।'[১৬]

তাহলে পুরুষরা যে অপরাধ করলে শাস্তি পাবেন না—নারীকে তার শাস্তি বহন করতে হবে! জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসটিতে এই প্রশ্ন নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'সকল যুগের সকল দেশের অপমানিতা লাঞ্ছিতা নারীদের উদ্দেশ্যে' উপন্যাসটি উৎসর্গীকৃত। উপন্যাসটিকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি পর্বে—আদি-পর্ব, অনুশাসনপর্ব আর স্ত্রীপর্ব। বারবার এই উপন্যাস মহাভারতের লাঞ্ছিতা নারীর অনুষঙ্গ এসেছে। অমূল্য-বাবু, সুতারার প্রতি সহানুভূতিশীল এই মানুষটির—

'চোখের সামনে বহু লাঞ্ছিত—বহু আকাঙ্ক্ষিত আসন্ন স্বাধীনতার এক বিভ্রান্ত বেদনাতুর চিত্র ভেসে উঠল এবং মনে হল সুতারাই যেন দেশজননীরই সেই বেদনার একটি রক্তাক্ত প্রতীক।'[১৭]

দেশমাতৃকা যখন নিপীড়িতা নারীর চরম লাঞ্ছনা-অবমাননার সঙ্গে একাকার হয়ে পড়ে তখনকার ট্রাজেডির কোনো তুলনা নেই। দেশবিভাগের ভিতর দিয়ে আমরা তেমনি কোনো ট্রাজেডিকেই তো প্রত্যক্ষ করেছি। জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসটি তাই শিল্পগুণে খুব উচ্চ স্তরের না হলেও এর তাৎপর্য অন্য-দিক থেকে যথেষ্ট গভীর আর ব্যাপক।

"মেঘে ঢাকা তারা" চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য আমাদের অনেকেরই মনে আছে। উদ্বাস্তু কলোনির একটি পথে হাঁটছে কাজের সন্ধানে ফেরা এক যুবতী—চটির ফিতে তার ছিঁড়ে গেছে! সামান্য থেমেই আবার সে চলেছে কোনো রকমে ফিতেটিকে সেপটিপিন দিয়ে মেরামত করে। পরে চলচ্চিত্রের শেষ দিকে ঠিক তেমনি একটি মেয়েকে আমরা হাঁটতে দেখি। তারও চটি ছিঁড়ে যায়। মেরামত করে সেও একই ভাবে হাঁটে। দেশবিভাগের পর এই সমাজসত্যটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসটিতে প্রায় অনুরূপ বিবরণ পেয়েছি:

'স্যাণ্ডেলের একটা স্ট্রাপ ছিঁড়ে গেল ফট করে। কিন্তু বিদিশা থামল না।'[১৮]

বস্তুতপক্ষে দেশবিভাগোত্তর প্রজন্মের নারীদের কর্মক্ষেত্রে আরও বেশি মাত্রায় বেরিয়ে আসতে হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন:

'চাকরির বাজার এত সহজ নয়—ক্ষুধাশীর্ণ মুখে, তালি দেওয়া জুতো পায়ে টেনে, বরানগর থেকে বজবজ পর্যন্ত সকরুণ পরিক্রমা।...

অথচ পাঁচ-সাত বছর আগেও এমন ছিল না। মেয়েদের স্কুলে একটি ভালো টিচার পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল, একজন গ্রাজুয়েটকে দু-তিনটি ইস্কুলে টানা-টানি করত। কিন্তু রাতারাতি সব বদলে গেছে। পার্টিশান! পূর্ববঙ্গের ঘরছাড়া মানুষ বন্যার মতো এসেছে কলকাতায়, জীবিকার সংগ্রাম হয়েছে নির্মমতম। আজ আর বি.এ—এম.এ-দের সেধে আনতে হয় না, মেয়েদের ইস্কুলের দরজায় তারা ধরনা দিয়ে বেড়ায়।'[১৯]

কিংবা: 'এককালে কলকাতার পথে-পথে শিক্ষিত বেকারের আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যেত—বিদিশা জানে। আজ মেয়েদের পালা আসছে।'[২০]

এইভাবে নারী-সমাজের ঘরে বাইরে সংঘর্ষমান জীবনবাস্তবতার একটি প্রবাহ উপন্যাসটিতে দেখাচ্ছেন নারায়ণবাবু।

বিদিশার বোন বিনতি সমস্ত কু-সংস্কার ত্যাগ করে "অগ্নিজ্বালা" বলে একটি ফিল্মে অভিনয় করার জন্য গৃহত্যাগ করেছে—দিদির কথা মানে নি। বিদিশা কিন্তু মেনে নেয় নি কোনোরকম আত্মিক অধঃপতন। সম্পাদকমশাই তাকে স্কুলের অন্য সহ-কর্মীদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির পরামর্শ দিলে সে স্কুলের কাজে ইস্তফা দিয়েছে। উপচিকীর্ষুর কামনার ছোবল থেকে নিস্তারের জন্য মর্যাদা আর শোভনতার সীমা বজায় রাখার জন্য সরে গিয়েছে কলকাতার এক প্রান্তে—মারাঠা ডিচের দিকে, সমাজবৃত্তের বাইরে। যেখানে:

'থমকে গেছে কর্পোরেশনের পীচের রাস্তা, তার পরেই শিথিল লগ্ন নুড়ি আর ধুলোর একটা দীন বিকল্প।' যেখানে ঘুরে ফিরে বেড়ায় 'হরিজন গণিকা'রা।[২১]

তো, ঘটনাচক্রে এই হরিজনপল্লীর দীন বিকল্পেও বিদিশার পক্ষে থাকা সম্ভব হয় নি। সে খুঁজে নিয়েছে গ্রামের একটি স্কুলের চাকরি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসের নায়িকাও দাদাদের আর্থিক সহায়তায় খুঁজে নিয়েছে উন্নতির সোপান। প্রথমে একটি খ্রীষ্টান মিশনারি বোর্ডিং। কারণ:

'হিন্দু বোর্ডিং-এ ঝামেলা অনেক। 'কুলজী' 'ঠিকুজী'র মতন জোরালো ঘোরালো পরিচয় লাগে। ব্রাহ্মবোর্ডিং-এ স্থানাভাব। এ ভালো হল সবাই ভাবে।'[২২]

সেখানে কারা থাকে?—'ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের মেয়ে। উচ্চবর্ণ কমই। নানা জাতি নবশাক, নমশূদ্র ঋষিশ্রেণীর ও আদিবাসীদের মেয়ে। শ্যামবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট হাসিমুখ মেয়ের দল। বেশীর ভাগ অনাথ। '৪২ সালের দুর্ভিক্ষের দিনের, দেশবিভাগের দুর্দিনের হারানো কুড়ানো পরিত্যক্তা সমাজবহির্ভূতা বালিকার দল। যাদের ঐতিহ্য কিছুই নেই, যদি বা থেকে থাকে তা ভুলে গেছে 'কন্যকা কুমারী'র দল।'[২৩]

আর কোন্ 'কন্যকাকুমারী' ভুলে গিয়েছিল ঐতিহ্যের কথা, জানি না। ওই উপন্যাসে সুতারা দত্ত ভোলে নি। ভুলে গেলে 'উচ্চবর্ণ কমই' বাক্যটি রচিত হত না। ভোলে নি বিদিশাও। স্কুলের সম্পাদক রামকৃষ্ণ ঘোষ যখন তাকে শিক্ষার জন্য ত্যাগস্বীকারের পরামর্শ দিচ্ছেন তখন বিদিশার কাছে বিষয়টি হয়েছে চরম সংক্ষোভের কারণ।

'কঠিন কৌতুকের মতো মনে হল, তার মতো বীণা আর বিনতিকে নিয়ে কলকাতার একটা হরিজনপল্লীতে যদি এমন বাসা বাঁধতে হত রামকৃষ্ণকে, যদি তাঁকে, এমনি করে তার মতো ঠেলে চলতে হত চারদিকের এই তুফানের সমুদ্র, তাহলে এই ত্যাগের কথা কতখানি বলতে পারতেন? বলতে পারতেন কি কোনোদিন?'[২৪]

অন্যত্রও তাকে কুণ্ঠিত হতে দেখি 'এই হরিজন-পাড়ার দীনতার' জন্য। এসব থেকে সুস্পষ্ট হয়ে

আসে অধঃপতনের প্রক্রিয়াটিকে এই দুই বর্ণব্যবস্থার ভাবাদর্শ-মুগ্ধ যুবতী মনের থেকে মেনে নেয় নি। অর্থাৎ যে ভাবাদর্শ তাদের অন্যায়ভাবে লাঞ্ছনা করেছে শত বেদনা সত্ত্বেও সেই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবাদর্শকে তারা অস্বীকার করতে পারে নি।

না পারুক, নারীসমাজের ঘরেবাইরে সংঘর্ষের উক্ত কালপর্বের সূচনা হিসাবে দেশবিভাগের উপর ভিত্তি করা উপন্যাস দুটিকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছে। বাঙালি হিন্দু সমাজের অসবর্ণ বিবাহ ঘটার সমাজ-তাত্ত্বিক বাস্তবতাটুকুও এসেছে এর হাত ধরে। "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার" মধ্যে সুতারা দত্তের ভাইঝির অনুরূপ বিবাহ হয়েছে। সেক্ষেত্রে উচ্চ দু-তিনটি বর্ণের মধ্যেই সেই অসবর্ণবিবাহের প্রগতি সীমাবদ্ধ রয়েছে সে ইঙ্গিতও পাই। এভাবেই বাঙলার বিশেষত উদ্বাস্তু সমাজে পরিবর্তনের কিছু-কিছু ছাপ ছায়া বর্তমান উপন্যাস দুটিতে পড়েছে, যাকে বলতে পারি স্বাধীনতা-উত্তর বাঙলা কথাসাহিত্যে আগন্তুক উপাদান।

পশ্চিমভারতের সঙ্গে পূর্বভারতের মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কিনা—জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর রচনায় এই প্রশ্নটির মীমাংসা করতে চেয়েছেন তাঁর সীমিত পরিসরে। "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা"-র নায়িকা তার ভাইদের সুন্দর বিবেচক ব্যবহার ও পরামর্শে ধীরে-ধীরে চলে গেছেন দিল্লীর এক কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা নিয়ে। আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরে। সেখানে তিনি খেয়াল করেছেন দিল্লী শহরের উদ্বাস্তুর স্রোত। লক্ষ করেছেন 'খণ্ডিত' 'মহাভারত'-এর 'নানা প্রদেশের মেয়ে'-দের ছাত্রী হিসাবে। তাঁর দৃষ্টিতে পড়েছে :

'রক্তাক্ত ১৯৪৬-এর পর ১৯৪৭-এর পরে সেই দিল্লী আর সে দিল্লীওয়ালা সভ্যতা এবং সেকালের সেই হিন্দু মুসলমানদের এখন দেখা পাওয়া যায় না···স্বাধীনতার পর এসে পড়েছে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুর দল আর কিছু সিন্ধি মানুষ।'[২৫]

এইভাবে একদিন তার সঙ্গে পরিচয় হয় কৌশল্যাবতীর। তিনিও অনুরূপ অভিজ্ঞতার অধিকারিণী। তাঁরও ধিক্কার :

'এই আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া। মরল কারা। দু' দেশের কত লক্ষ-লক্ষ গরীব, কত মেয়ের মান-ইজ্জৎ গেল, চুরি হল। খুন হল দু পক্ষের গরীবের মেয়েছেলে।'[২৬]

মিল সামান্য থাকলেও কৌশল্যাবতীর কাছেই সুতারা দত্ত বুঝতে পারেন পার্থক্যও। সুতারা দত্ত খেয়াল করেন পাঞ্জাবে 'আচার-বিচার ছোঁয়া-ছুঁয়ির ঝামেলা নেই বাংলাদেশের মত।' এই সময় আমাদের সন্দেহ জাগে জ্যোতির্ময়ী দেবী ঠিক-ঠিক লক্ষ করেছেন কি? নাকি তিনি নিছক লেখার জন্যই লিখে গেছেন? একদিন কৌশল্যাবতীর সঙ্গে কথায়-কথায় সুতারা জেনেছেন :

'নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে অত বেশি কড়াকড়ি নেই···। তবে উচ্চবর্ণের মধ্যে কিছু আছে বৈকি। কিন্তু শিখদের মধ্যে জাতের ধর্মের কড়াকড়ি কম। গুরুদ্বারের অনুমতি পেলে ওরা শুদ্ধি করে নেয়। সব মেয়েদের ফেলে দেয় না।'[২৭]

এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি আর্যসমাজীদের শুদ্ধিকরণের আন্দোলনের কথাও; যার সঙ্গে বাঙলার অভিজাতবর্গে সীমাবদ্ধ ব্রাহ্ম সমাজের কোনো তুলনাই চলে না।

তাহলে এই আলোচনার মধ্য থেকে একটি রহস্য আমাদের কাছে সামান্য হলেও পরিষ্কার হয় নাকি? দেশবিভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঠিক এক রকম হয় নি; পূর্ব-ভারতের বাঙালি উদ্বাস্তুরা অনেকটাই বঞ্চিত। তার কারণ কি আংশিকভাবে হলেও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না? বস্তুতপক্ষে, শিখ ধর্মান্দোলন পশ্চিম-ভারতের উদ্বাস্তু হয়ে আসা অ-মুসলিম জনসাধারণকে যে ঐক্য-দান করেছিল, পূর্বভারতে তেমন কিছু ঘটে নি। সম্ভবত এরকম কোনো কিছুর অভাবেই আমরা আমাদের

সমাজটিকে একটি ঐক্যবদ্ধ জৈবিক সত্তা হিসাবে দেখি নি। ধর্ম এখানে অবমানিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখায় নি। ভিসা-অফিসের যে সংবাদ আমরা ইতিপূর্বে উপস্থিত করেছি তার সাক্ষ্যে অনুরূপ সত্যই কি আমরা অনুভব করি না? পশ্চিম ভারতে দেশ-ত্যাগকে যেভাবে সামূহিক ঘটনা হিসাবে দেখা হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গে তেমন ঘটে নি বলেই মনে করি। ১৯৫৫ সালে কলকাতা-জেলার কংগ্রেস সম্মেলনে অতুল্য ঘোষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন : 'অনিশ্চিত সংখ্যক উদ্বাস্তুর অবিরাম সমাগম ঘটিতে থাকিলে পৃথিবীতে কোনো দেশের পক্ষেই পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।'[২৮]

তিনি প্রস্তাব দেন কোনো না কোনোভাবে ভারত সরকারকে রাজি করাতে, যাতে তারা পূর্ববঙ্গ থেকে আর কোনো উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে না আসে সেজন্য চাপ দিতে। অন্যান্য তরফে যারা, তাদের ভূমিকাও যে খুব উজ্জ্বল ছিল তা নয়। মোটকথা, দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে আমরা কখনই ঐক্যবদ্ধ সমাজ হিসাবে প্রতি-ক্রিয়া জানাই নি। উপন্যাস তো আর গগন-পুষ্প নয়? তা নয় কোনো 'অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন' বা দেবদূতের ঝুলি থেকে বেরুনো 'দৈব তাবিজে'র মতো মহার্ঘ কিছু—যা আকস্মিক জন্ম নেয়; সমাজসত্যের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই এমন অমূলতরু বিদেশী অর্কিডও তা নয়। আমাদের সমাজের এক অংশের বেদনা অন্য অংশকে ভালোভাবে ছুঁয়ে যায় নি—এমনকী লাঞ্ছিতা-রমণীদের জন্যও আমরা বদ্ধ করে রেখেছি সমাজের দুয়ার। এরকম দুঃখ নিয়ে, কষ্ট নিয়ে, আশা-ভঙ্গের বেদনা নিয়ে বড়োজোর কাঁদুনি গাওয়া যায়—মহৎ সাহিত্য কেমন করে সম্ভব? বাণিজ্য করা চলে—সময় সুযোগ মতো রসে বশে আলোচনাও হয়ত চলে। চলে না কি? সমর সেনের "বাবুবৃত্তান্তে"র একটি বাক্য আমরা ব্যবহার করে শেষ করতে চাই—'এই অলস মদিরতা, এই রাধাভাব কি মধ্যবিত্তের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য?' অনায়াসে বলতে পারতাম বাঙালি মধ্যবিত্তের!

অনুষঙ্গ :

১. গুহ, সত্য : 'একালের গল্প-পদ্য আন্দোলনের দলিল' : ডিসেম্বর, ১৯৭০। অধুনা, কলকাতা। ২৩৭-৩৮ পৃ।

২. লাহিড়ী, কার্তিক : 'দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও আগামী'; "পরিচয়"; জানুয়ারি, ১৯৯০।

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'বিদিশা'; "নারায়ণ গঙ্গোঃ রচনাবলী"; ৯ খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ; কলকাতা। ৪২ পৃ।

৪. জ্যোতির্ময়ী দেবী : 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'; রূপা অ্যাণ্ড কোং। কলকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী। মার্চ, ১৯৬৮, "প্রবাসী" শারদীয়া, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ। 'ইতিহাসে স্ত্রীপর্ব'। ৮ পৃ।

৫. তদেব।

৬. দে, ড. অমলেন্দু : 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি'; রত্না প্রকাশন, কলকাতা। ৯ মে, ১৯৭৫ খ্রীঃ। ১২৯-৩০ পৃ।

৭. পঞ্চ—'শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালি'; "বাঙলা আমার বাঙলা"; লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা। অক্টোবর ১৯৮৫ খ্রী।

৮. 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৬২ বঙ্গাব্দ। ৫২৭ পৃ।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'হিন্দু মুসলমান' "কালান্তর", বিশ্বভারতী; অগ্রহায়ণ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। ৩১৩ পৃ।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকহিত'; ঐ। ৪০ পৃ।

১১. 'বিদিশা'। ১৪ পৃ। ১২. তদেব। ২ পৃ।

১৩. 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। ৩৬-৩৭ পৃ।

১৪. তদেব। ১৫. তদেব। ১৬. তদেব। ৪৩ পৃ।

১৭. তদেব। ৩৯ পৃ।

১৮. 'বিদিশা'। ৬৮ পৃ।

১৯. তদেব। ২৬ পৃ। ২০. তদেব। ২১. তদেব। ৩ পৃ।

২২. 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। ৫২ পৃ।

২৩. তদেব। ৫৩ পৃ।

২৪. 'বিদিশা'। ৪৩ পৃ।

২৫. 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। ৭৫ পৃ।

২৬. তদেব। ৮৯ পৃ।

২৭. তদেব। ৯১ পৃ।

২৮. 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

মতামত

১

কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার স্বরূপ

মে ১৯৯১ সংখ্যায় "মন ও ক্যান্সার" শিরোনামায় শ্রীমতী বৈশালী সিন্‌হার মতামতটি বৈপ্লবিকচেতনা-সমৃদ্ধ।

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় সভা-সমিতির আলোচনায় এবং সরকারি প্রচারমাধ্যমে এমন একটা ধারণা দৃঢ়মূল করে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্পদ ও জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। এর আগে ম্যালথাসের মৃত্যুনিয়ন্ত্রণবাদকেও একইভাবে প্রচার করা হয়েছিল সম্পদ ও জনসংখ্যার ভারসাম্যরক্ষার উপায় হিসাবে। নিরপেক্ষ অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে মানুষের উদ্ভাবনী সম্ভাবনা এবং প্রাকৃতিক পদার্থের সম্পদ-সম্ভাবনা অসীম। এই অসীম সম্ভাবনাকে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যরক্ষা সম্ভব। বাস্তবে ব্যক্তিগত মালিকানার মুনাফাসাপেক্ষ অর্থনীতি মুনাফার স্বার্থে সম্পদের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করতে চায় না। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ যথার্থভাবে ব্যবহার না করে, উৎপাদনের উপকরণগুলোর চূড়ান্ত যোগ্যতা কাজে না লাগিয়ে, উৎপাদিত দ্রব্য নষ্ট করে দিয়ে সর্বদাই সম্পদের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম রেখে মুনাফা সুনিশ্চিত করা হয়। কর্তৃত্ববাদী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজের ত্রুটি গোপন রাখতে জন্মান্তরবাদ, মৃত্যু নিয়ন্ত্রণবাদের মতো জন্মনিয়ন্ত্রণবাদকেও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রীমতী সিন্‌হা অর্থনীতি ও যৌননীতির নধ্যে যোগসূত্রে স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে সমর্থ হয়েছেন যে মুনাফাসাপেক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উন্নত প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের ফলে মানুষের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাওয়ায় মানুষের জন্ম অবাঞ্ছিত হয়ে গেছে বলে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যা-রোধের এত আয়োজন।

ক্যান্সার, দন্তক্ষয়, আলসার, টিউমার, কিডনি, হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রর ব্যাধি, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, আর্থারাইটিস এবং বহুবিধ মানসিক ও মনঃশারীরিক ব্যাধি প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ (?)দের বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণত জীবাণু-সংক্রমণ, আবহাওয়া, বংশগতি, খাদ্য, পানীয়, মাদক, দূষিত পরিবেশ ইত্যাদির উপর এমন একটা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় যে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ত্রুটি দূর করতে পারলেই সুস্থ জীবনযাপন করা সম্ভব।

কয়েক হাজার বছর ধরে অপরাধকে ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত আচরণ হিসাবে গণ্য করে অপরাধীকে শাস্তিদানের মাধ্যমে অপরাধ দূর করার ধারণা ও ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। শ্রীমতী সিন্‌হার বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্লেষণে জানা গেল যে ত্রুটিপূর্ণ অর্থনীতি ও যৌন-নীতির প্রভাবে মানুষের দেহ ও মনে সংঘটিত জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত বিশৃঙ্খলা কিভাবে মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক অসুস্থ প্রবণতার জন্ম দেয়। অসুস্থ ব্যক্তির মতো অপরাধীরও চিকিৎসা প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন অপরাধমূলক অসুস্থতা-সৃষ্টিকারী আর্থ-যৌননৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যাঁরা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা-প্রবর্তিত মূল্যবোধ অনুসরণ করে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে মতামত প্রকাশ করে থাকেন, তাঁরা কেন করেন? হয় চিন্তার দৈন্যের কারণে সমস্যার স্বরূপ বা মূল কারণ তাঁদের চেতনায় ধরা পড়ে না, অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় তাঁরা প্রকৃত সত্য গোপন রেখে কর্তৃত্ববাদ -আরোপিত সত্যর পক্ষে প্রচার চালাতে থাকে।

কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার স্বরূপ প্রকাশ করে এমন লেখা ও মতামত "চতুরঙ্গ"-র কাছে ভবিষ্যতেও আশা করব।

রফিক-উল ইসলাম
সালেপুর, বর্ধমান

২

সুস্থ সমাজের সন্ধানে একটি পথের প্রস্তাব

"সুস্থ সমাজের সন্ধানে" শিরোনামায় মাননীয় শিবনারায়ণ রায়ের রচনাটি মূল্যবান।

শ্রী রায় তাঁর আলোচনায় সুস্থ সমাজের সন্ধানে সন্ধানী পাঁচটি পথের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ কোনো পথের উল্লেখ না করে সাধারণভাবে প্রত্যেকটা পথের ক্ষেত্রে যা বলা যায় তা হল— সমাজের অসুস্থতার উৎস বা মূল কারণ সম্পর্কে সমাজের ব্যাপক মানুষকে সচেতন না করে সুস্থ সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু উল্লিখিত মত বা পথগুলিতে অসুস্থতার লক্ষণ বা উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করা হলেও উৎসের কারণ সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত রয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে অর্থনৈতিক বিবর্তনের পথে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সম্পদের উপর নারীর অধিকার খর্ব হয়। এই অবস্থায় নারীর প্রয়োজন হয় জীবন-ধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। পুরুষের স্বার্থে পুরুষ উত্তরাধিকারী উৎপাদন ও পিতৃত্ব নির্ধারণের যৌননৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উভয়ের প্রয়োজন মেটাতে যে আর্থ-যৌননৈতিক চুক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হয়, সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম 'বিবাহ ও 'পরিবার'। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীর উপর পুরুষের শাসন ও শোষণ কায়েম রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শোষণপ্রক্রিয়া সচল রাখা হয়। সামাজিক অসুস্থতার উৎস বা মূল কারণ নিহিত রয়েছে সম্পদ ও সঙ্গির উপর ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক আর্থ-যৌননৈতিক ব্যবস্থাগত ত্রুটির মধ্যে।

সমাজমনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে, সামাজিক মানুষের যাবতীয় উদ্যোগ, আচরণ ও ক্রিয়াশীলতার পেছনে থাকে অস্তিত্বরক্ষা ও বংশ-বিস্তারের জৈব ধর্ম পালনের তাগিদ। সামাজিক মানুষের অস্তিত্বরক্ষা ও বংশবিস্তারের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের অর্থনীতি ও যৌননীতির দ্বারা। অর্থনীতি ও যৌননীতি যদি মানুষের অস্তিত্বরক্ষা ও বংশ-বিস্তারের চাহিদা স্বাভাবিকভাবে পরিপূরণ করতে পারে তবে মানুষের আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় না এবং সমাজ সুস্থ থাকে। একইভাবে বলা যায়— সমাজ অসুস্থ হলে বুঝতে হবে যে সমাজের অর্থ-নীতি ও যৌননীতি মানুষের অস্তিত্বরক্ষা ও বংশ-বিস্তারের জৈব চাহিদা সুস্থভাবে পরিপূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

সুস্থ সমাজের সন্ধানে উল্লিখিত পথগুলোতে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না যে সমাজে প্রচলিত অর্থনীতি ও যৌননীতির নীতিগত ভিত্তি ত্রুটিযুক্ত হলে, পরিকল্পনা ও প্রয়োগপদ্ধতি বিভিন্ন ভাবে বারংবার পরিবর্তন করলেও সমাজকে সুস্থ করা যায় না। যে মানুষ তার অস্তিত্বরক্ষা ও বংশবিস্তারের জৈব চাহিদা পরিপূরণের তাগিদে সমাজ-প্রক্রিয়া সচল রাখে, সেই মানুষ যদি অর্থনীতি ও যৌননীতির নীতিগত ত্রুটি সম্পর্কে অসচেতন থাকে, তবে কোনো পদ্ধতিতেই সুস্থ সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বরং এই অসচেতনতার মধ্যে সুস্থ সমাজ গঠনের যে-কোনো উদ্যোগ অসুস্থতাকে আরও জটিল করে তোলে।

পরিশেষে সুস্থ সমাজের সন্ধানে ষষ্ঠ একটা পথের প্রস্তাব রাখছি। এলাকাভিত্তিক জনসংগঠন গড়ে তুলে ব্যক্তিমালিকানার আর্থ-যৌনৈতিক ব্যবস্থার নীতিগত ত্রুটি সম্পর্কে ব্যাপক মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। সচেতন মানুষ বিকল্প আর্থ-যৌনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যে ব্যবস্থায় সুস্থভাবে মানুষের জৈব ধর্ম পালনের নিরাপত্তা থাকবে। এই নিরাপত্তাই মানুষকে সুস্থ সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

স্মরজিত দাস
তালবাগিচা
মেদিনীপুর

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দারী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দারি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ভ ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

With best compliments from :

★★
★

RADHAKRISHNA BIMALKUMAR LTD.

216, A. J. C. BOSE ROAD,

CALCUTTA-700 017.

Phones : 47-0818/40-3939 Gram : SAMBHAVIT Telex : 5480